জেম্‌স্ আব্রাম্ গারফীল্ড

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

জেম্‌স্‌ আব্রাম্‌ গার্‌ফীল্ড

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
২১০।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।
২১০।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—
প্রকাশকের নিকট
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

দাম ১।০ সিকা]

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮।৪-এ বিডন রো—কলিকাতা

ভূমিকা

আমাদের দেশে জেম্‌স্‌ আব্রাম্‌ গার্‌ফীল্ডের নাম বেশী লোকে জানেন কি না সন্দেহ, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে 'ফ্রম দি লগ কেবিন টু দি হোয়াইট্‌ হাউস্‌' অর্থাৎ কাষ্ঠময় কুটীর হইতে রাষ্ট্র নেতার প্রাসাদে উন্নয়ন এই কথাটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গার্‌ফীল্ডের জীবন-চরিত উপন্যাস অপেক্ষাও মনোহর এবং শিক্ষাপ্রদ। বর্ত্তমান গ্রন্থকার তাঁহার প্রচলিত ধারা বজায় রাখিয়া অর্থাৎ গার্‌ফীল্ড যেন নিজেই নিজের জীবন চরিত বলিয়া যাইতেছেন এইভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের জীবন-কাহিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। এই জন্য বাঙ্গালা দেশ তাঁহার কাছে ঋণী রহিল।

গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা অতি সহজ ও সুললিত ভাষায় লিখিত। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেরাও ইহা পড়িয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে এরূপ পুস্তক প্রণয়নের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বহু যুবক যে এই পুস্তক পাঠ করিয়া জীবন-সংগ্রামে উৎসাহ পাইবে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতে দেখিলে সুখী হইব।

আজ বহু বৎসর যাবত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালী যুবকদিগের মনে শ্রমের মর্য্যাদার কথা অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার কাজ, লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা অবিরত চেষ্টা করিতেছেন। গার্‌ফীল্ডের জীবনী শ্রমের মর্য্যাদার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি এক দিনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা হন নাই। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে জীবিকা অর্জ্জন করিবার জন্য কত রকম শ্রমের কাজ করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তিনি কোন

প্রকাশক—
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।
২১০।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—
প্রকাশকের নিকট
ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

দাম ১।০ সিকা]

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস
সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮।৪-এ বিডন রো—কলিকাতা

ভূমিকা

আমাদের দেশে জেম্‌স্‌ আব্রাম্‌ গার্ফীল্ডের নাম বেশী লোকে জানেন কি না সন্দেহ, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে 'ফ্রম দি লগ কেবিন টু দি হোয়াইট্‌ হাউস্‌' অর্থাৎ কাষ্ঠময় কুটীর হইতে রাষ্ট্র নেতার প্রাসাদে উন্নয়ন এই কথাটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গার্ফীল্ডের জীবন-চরিত উপন্যাস অপেক্ষাও মনোহর এবং শিক্ষাপ্রদ। বর্ত্তমান গ্রন্থকার তাঁহার প্রচলিত ধারা বজায় রাখিয়া অর্থাৎ গার্ফীল্ড যেন নিজেই নিজের জীবন চরিত বলিয়া যাইতেছেন এইভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের জীবন-কাহিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। এই জন্য বাঙ্গালা দেশ তাঁহার কাছে ঋণী রহিল।

গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা অতি সহজ ও সুললিত ভাষায় লিখিত। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেরাও ইহা পড়িয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে এরূপ পুস্তক প্রণয়নের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বহু যুবক যে এই পুস্তক পাঠ করিয়া জীবন-সংগ্রামে উৎসাহ পাইবে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতে দেখিলে সুখী হইব।

আজ বহু বৎসর যাবত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালী যুবকদিগের মনে শ্রমের মর্য্যাদার কথা অঙ্কিত করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার কাজ, লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা অবিরত চেষ্টা করিতেছেন। গার্ফীল্ডের জীবনী শ্রমের মর্য্যাদার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি এক দিনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা হন নাই। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে জীবিকা অর্জ্জন করিবার জন্য কত রকম শ্রমের কাজ করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তিনি কোন

দিন কোন কাজ তুচ্ছ মনে করেন নাই। যখন যে কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহার এই এক সুফল হইয়াছিল যে, তিনি জীবনে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোন সামান্য কাজই ছোট নয়—এই শিক্ষা আমরা তাঁহার চরিত্র হইতে বারে বারে পাই। প্রত্যেক শ্রমসাধ্য কার্য্য তখনই গৌরবজনক হইয়া দাঁড়ায়, যখন তাহার অনুষ্ঠাতা উহাকে ছোট মনে না করিয়া আপনার সমগ্র মন-প্রাণ তাহাতে অর্পণ করেন। আমাদের গীতায় ফলের বাসনা না করিয়া নিষ্কামভাবে কাজ করিয়া যাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গার্ফীল্ডকে গীতায় উক্ত কর্ম্ম-যোগীরূপে বর্ণনা করিলে ভুল হয় না।

গার্ফীল্ডের জীবনী হইতে দ্বিতীয় শিক্ষা পাওয়া যায়, মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ সম্বন্ধে। যাঁহারা বড় হইয়াছেন, ইতিহাসে যাঁহাদের নাম অমর হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের অনেকের মাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। গার্ফীল্ডও এ বিষয়ে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গারফিল্ডের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গার্ফীল্ডের জন্য অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দ্বারা অতি সহজে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া লন।

গার্ফীল্ডের কাহিনী আমাদের চোখের সামনে এক উচ্চ আদর্শ উপস্থিত করে। গার্ফীল্ডকে কখনো নিগ্রোদের দাসত্বের বিরুদ্ধে সেনাপতিরূপে দেখি কখনো বা ব্যবস্থাপক বা রাষ্ট্রেনেতারূপে দেখি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সকলের মূলে ছিলেন সেই অদম্য মানব যিনি জীবনের কোন অবস্থাতেই কোন বাধার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, যিনি কোন অন্যায় বা পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভীত হন নাই এবং যাঁহার মনে জানিবার ও অনুসন্ধান করিবার অসীম আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা ছিল খুব গভীর। এক সময়ে তিনি ইস্কুল মাষ্টার

থাকিয়াই সারা জীবন কাটাইতে চাহিয়াছিলেন। সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র বালক কিরূপে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন ও রাষ্ট্রনেতা নির্ব্বাচিত হইলেন, সে এক আশ্চর্য্য কাহিনী।

গার্ফীল্ডের সহিত আমরাও কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—"বন্ধুগণ! কর্ম্ম করিয়া যাও, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া, এদিক্ ওদিক্ না চাহিয়া সোজা চলিতে থাক। নিজের জন্য এক আধ ছটাক কাজ করিতে যাইয়া মহামূল্য জীবনটাকে অনর্থক বলি দিও না। কাজ যাহা সামনে আসিবে তাহা সাগ্রহে ডাকিয়া লও। জীবনের কোন্ সময়ে কোন্ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে, তাহা বলা শক্ত। আমরা সকলেই জগৎকে সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য আসিয়াছি।"

ফাল্গুন, ১৩১৬। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা।

প্রকাশকের নিবেদন

দীর্ঘকাল ধরিয়া অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার পর 'জেম্‌স্ আব্রাম্ গার্‌ফীল্ড' প্রকাশিত হইল। কিন্তু অন্য সকল বাধা বিঘ্ন অপেক্ষা গ্রন্থকারের অনিচ্ছালব্ধ প্রবাসই প্রকাশকের দায়িত্বকে কতকাংশে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিল; তাহারই ফলে গ্রন্থমধ্যে হয়ত কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষিত হইবে। আশা করি বিবেচক পাঠক-পাঠিকা ইহার এই অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখাইবেন। ইতি—

নিবেদন

ইংরেজী "ফ্রম্ লগ্ ক্যাবিন টু হোয়াইট্ হাউস"—বই শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। সেই বইকে ভিত্তি করিয়াই এই বই—"জেম্‌স্ আব্রাম্ গার্‌ফীল্ড"—লেখা হইয়াছে। এই বই খানি লেখা হইয়াছিল "আব্রাহাম্ লিঙ্কলন" লেখার আগে, কিন্তু ছাপা হইল উহার পরে। কারণ মানব-সভ্যতার ইতিহাসে লিঙ্কলনের একটা নিজস্ব দান আছে—গার্‌ফীল্ডের তাহা নাই। গার্‌ফীল্ড শক্তিশালী পুরুষ, মানুষের মতো মানুষ সন্দেহ নাই। কিন্তু যে যুগে লিঙ্কলন ছিলেন একটী ভাব রাজ্যের রাজা, সেই যুগে গার্‌ফীল্ড প্রমুখ মনীষিগণ ছিলেন সেই রাজ্যের এক একজন দিকপাল।

কাঠুরিয়া, মাঝি-মাল্লা, চাষী এবং ছুতার মিস্ত্রীর জীবন ইঁহাদের উভয়ের জীবনের সঙ্গেই জড়িত। কেবল কশাই এবং আমীনরূপে লিঙ্কলন দেখা দিয়াছেন একরূপে, আর ক্ষার ব্যবসার অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃত শিক্ষকের গুণ লইয়া গার্‌ফীল্ড দেখা দিয়াছেন আর একরূপে। জ্ঞানলাভের জন্য দুইজনেরই আকুল আগ্রহ ছিল। নানা রকম বৈচিত্র্যময় জীবনের ভিতর দিয়া ইঁহারা উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতির পদলাভে ইঁহারা দুইজনেই নিষ্কাম ছিলেন। জীবনের অবসানও হইয়াছিল দুইজনের একই ভাবে—গুলীর আঘাতে।

বলা বাহুল্য, এই বইখানিও "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীরে"র ভাব-ভাষার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

গারফীল্ড রচনার সময়ে অনেকের নিকট নানা রকম অসুবিধার ভিতর নানা ভাবের সাহায্য পাইয়াছি, সেই জন্য তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ। কিন্তু বাংলা ভাষায় গারফীল্ড রচনার জন্য উৎসাহিত হইয়া, যিনি "পেন্সিলে"র মতো একটী ক্ষুদ্র বস্তু দিয়া উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অতি বড় স্মৃতিটী এই বইয়ের সঙ্গে চিরজড়িত হইয়া রহিল।

দুঃখ-দৈন্যের পাষাণ চাপ ঠেলিয়া ভাবী বাংলার ঘরে ঘরে যে সব সন্তান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, গারফীল্ডকে তাহাদের আদর্শরূপে খাড়া করিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার



কাঠুরিয়া বেশে গারফীল্ড

জেমস্ আব্রাম্ গারফীল্ড

আমি চাষার ছেলে। আমেরিকার জঙ্গলী মুল্লুকের এক আবাদে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—১৮৩১ সালে। দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অবনত সমাজে আমার জন্ম। কাজেই, অনেক রকমের ত্রুটী অঙ্গে জড়াইয়া লইয়া আমাকে জীবন সংগ্রামের জন্য বাহির হইতে হইয়াছিল। সেদিনে নিজের মা আর ভাই-বোন ব্যতীত দেখার ভিতর দেখিতে পাইতাম, উপরে নীলাকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র আর নীচে জঙ্গলের পর জঙ্গলের তরঙ্গ। আর শুনিতে পাইতাম বিশেষভাবে রাত্রিকালেই নেকড়ে এবং চিতা বাঘের অবিশ্রান্ত ভয়ঙ্কর গর্জ্জন।

সেকালে আমেরিকার নিবিড় বনে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে লড়াই করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া, জমি চষিয়া, সোনার সংসার

পাতিয়া যাঁহারা সামান্য ভাবে সুখময় জীবন যাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের অন্যতম। আমার পিতামহ টমাস গারফীল্ড ছিলেন নিউ-ইয়র্কের নিকটবর্ত্তী কোনো পল্লীর চাষী-গৃহস্থ। আমার পিতার বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর, তখন আমার পিতামহ কয়েকটী শিশুসন্তান এবং বিধবা স্ত্রীকে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় রাখিয়া ইহজগৎ হইতে প্রস্থান করেন। বিধবা গারফীল্ডের এই দুঃসময়ে তাঁহার প্রতিবেশী জেম্‌স্ ষ্টোন মহাশয় আমার পিতা আব্রাম্‌কে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া নিজের সন্তানের মতো পালন করিতে থাকেন।

তখনকার দিনে আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা কোনো স্থানেই একেবারে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছিলেন না। বোধ হয়, অনেকেই দুই চারি বৎসরও এক জায়গায় বাস করেন নাই। কারণ, তাঁহারা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সুখময় জীবনের সন্ধানেই এখানে আসিয়াছিলেন। কাজেই, কি পুরুষ কি নারী, কেহই পেছনে পড়িয়া থাকিতে চাহেন নাই। তখন ওহায়ো প্রদেশের উর্ব্বর জমি এবং ধন-দৌলতের কথা চারিদিকে প্রবাদ-বাক্যের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই লোভে আমেরিকার নানা অঞ্চলের লোকেই ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া দলে দলে ওহায়োর দিকে ছুটিতেছিল। আমার পিতা আব্রামও তাঁহার অন্নদাতার নিকট বিদায় লইয়া নিজের ভাগ্যের

সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং ক্লীভ্ল্যাণ্ডের নিকটবর্ত্তী নিউবার্গে কিছু জমি-জমা সংগ্রহ করিয়া চাষের কাজে লাগিয়া গেলেন।

সেকালে আমেরিকান জঙ্গলের বাসিন্দারা গাছের গুঁড়ি দিয়া এক রকম ঘর তৈরী করিত। এই ঘরগুলিকে 'লগ্ ক্যাবিন' বলিত। আমার পিতারও একখানা লগ্ ক্যাবিন ছিল। বৎসর দুই পরে এই ক্যাবিনেই আমার অন্তরের মঙ্গলদীপ, জীবনের ধ্রুবতারা, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইলাইজা আমার পিতার সহধর্ম্মিণীরূপে প্রবেশ করেন। এই ক্যাবিনখানি লম্বায় প্রায় চৌদ্দ হাত এবং চওড়ায় হাত বারো ছিল। সাধারণতঃ লগ ক্যাবিনগুলি এই আকারেরই হইত। ইহাতে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই ছিল। আলো-বাতাসের চলা-ফেরার পথও নেহাৎ কম ছিল না। আমার পিতামাতা এই গৃহে নয় বৎসর বাস করেন। এই ক্যাবিনে আমার দুই বোন ও এক ভাইয়ের জন্ম হয়।

আমার পিতা বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন স্বীকার করিতেন, এবং সেইজন্য তাঁহার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল বিরাট্। তাঁহার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাঁহার নির্ভীকতা এবং কর্ম্মদক্ষতা। নিজহাতে চাষের কাজ করিয়াও তিনি দুইবার ওহায়ো-পেন্সিল্ভ্যানিয়ার খাল কাটার ঠিকাদারীও লইয়াছিলেন। সংসার ক্রমেই বড় হইয়া চলিতে-

ছিল বলিয়া তিনি সতেরো মাইল দূরে অরেঞ্জে দেড়শত বিঘা জমি কিনিয়াছিলেন। জমির দাম পড়িয়াছিল তিনশত টাকা। আমার এক মাসীও ঐ জমির পাশেই কতকটা জমি খরিদ করিয়াছিলেন। কাজেই, দুই পরিবার একই সময়ে আবার নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল, আবার লগ ক্যাবিন তৈরী হইল।

এই ক্যাবিন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা বড় এবং দেখিতে সুন্দর হইয়াছিল। ক্যাবিন তৈরীর প্রণালীটি ছিল খুব চমৎকার। আস্ত আস্ত গুঁড়ির একটীকে আর একটীর উপর পর-পর বসাইয়া, কাদা-মাটী দিয়া মাঝের ফাঁকগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। এই সকল ক্যাবিনে শীত-গ্রীষ্মে বাসের সকল সুবিধাই থাকিত। কাদা এবং কাঠের সাহায্যে ধোঁয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য পিরামিডের আকারের একটী করিয়া চিম্‌নী থাকিত। ঘরের ছাদ মার্‌বল্ অথবা বালিপাথরের স্তর দ্বারা তৈরী হইত। ঝড়-বাতাসের হাত হইতে ছাদ-রক্ষার জন্য উপর হইতে দুইপাশে নীচু পর্য্যন্ত ভার ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। গাছের গুঁড়িগুলিকে কুড়ুলের সাহায্যে দুই সমান ভাগে চিরিয়া মসৃণ করিয়া পাশে পাশে সাজাইয়া গেলেই ঘরের মেজে তৈরী হইয়া যাইত। আমাদের ঘরে ছাদের নীচে একটা পাটাতন ছিল। ঘরের এককোণে একটা স্থায়ী মইয়ের সাহায্যে উহাতে উঠানামা চলিত। ছেলেপিলেরা পাটাতনের মেজেতে খড়ের বিছানায় শয়ন করিত। ঘরে একটী মাত্র দরজা ছিল

এবং উহা তক্তা দিয়াই তৈরী হইয়াছিল। তিনটি জানালার সাহায্যে যথেষ্ট আলো এবং হাওয়া ঘরে প্রবেশ করিত। এই ঘরেই আমার জন্ম হয়।

ভাই-বোনদের ভিতর আমিই ছিলাম সব চেয়ে ছোট। সেইজন্যই পিতামাতা এবং ভাইবোনেরা তাঁহাদের ভালোবাসা অজস্রধারে আমার উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন। আমার জন্ম-গ্রহণের দেড় বৎসর পর আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল বত্রিশ বৎসর। পিতার মৃত্যুদিনে আমার মা'র এবং ভাইবোনদের দুঃখের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কল্পনা করিলে আমি আজও ভয়ে এবং বেদনায় অস্থির হইয়া পড়ি। সেদিন আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন মাইল সাতেক দূরে।

২

সাধারণতঃ যেমন ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ছোটবেলায় পিতামাতার মৃত্যুতে সন্তানেরা সহজেই যেমন অকাল-বুদ্ধিমান সাজিয়া পড়ে, আমার পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাইবোনেরাও তেমনি খুব হুঁশিয়ার হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে যে জিনিষটা না হইলে তাহাদের চলিত না, এখন সেই জিনিষের আর কোনো প্রয়োজনই থাকিল না। এমন অবস্থায় দরদী কেহ সাম্‌নে থাকিলে তাহার অন্তরে ব্যথা পাইতে বাধ্য। তাঁহাদের এসব সাবধানতা মা'র চোখ এড়াইতে পারে নাই। ইহাতে মা'র বেদনা না-কমিয়া বরং অনেকখানি বাড়িয়াই গেল।

মা বলিয়াছেন সে সময় তাঁহার মনে হইত যেন আকাশটা ভাঙ্গিয়া তাঁহার মাথার উপর পড়িয়া গিয়াছে! এমন ভীষণ জঙ্গলে সহায়-সম্বলহীনা একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে এরকম না-ভাবিয়া উপায়ান্তর ছিল না। একে কপর্দ্দকহীন অবস্থা, সন্তানেরা নাবালক, তার উপর আবার দেনার পরিমাণও নিতান্ত কম ছিলনা। মা'র মুখমণ্ডলে পিতার মৃত্যুজনিত বেদনা সেদিন যে আসন পাতিয়া বসিয়াছিল, এই দীর্ঘকাল পরেও তাহার কায়েমী স্বত্বের কোনো খর্ব্বতা দেখা যায় নাই।

আমার মনে হয়, একমাত্র সন্তানদের কথা ভাবিয়াই সেদিন তাঁহার দেহখানা বেদনার উত্তাপে ফাটিয়া যায় নাই।

মা'র দেহের শক্তি হয়ত সকল নারীর মতোই ছিল, কিন্তু তাঁহার মনের জোর যে জগতের প্রথম শ্রেণীর নারীদের চেয়ে কম ছিলনা, ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কখনো কোনো সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে মা ঘরের এক নির্দ্দিষ্ট কোণে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ভগবানের কাছে নিজের দুঃখ জানাইতেন। শুনিয়াছি, মা নাকি এইভাবে চিরদিন নানা রকম চিন্তা-ভাবনা হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন।

দেনা-পরিশোধ এবং সন্তানদের প্রতিপালন কিভাবে হইতে পারে, ইহাই হইয়াছিল মা'র তখন সব চেয়ে বড় ভাবনা। আমাদের জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী মাকে জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া তাঁহার কোনো আত্মীয়ের নিকট চলিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। এমন অবস্থায় এরূপ পরামর্শ সাধারণতঃ সকল লোকেই দিয়া থাকে। কিন্তু মা আমার, দমিবার পাত্র ছিলেন না, চিত্ত তাঁহার স্থির ছিল। পলকের ভিতর সকল দিক বিবেচনা করিয়া লইয়া জবাব দিলেন, "এ জায়গা আমি কোনো মতেই ছাড়িতে পারিব না। আর বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া আমার কোনো আত্মীয়ের গলগ্রহও হইতে পারিব না। আমি এই ঝড় কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, আমার সন্তানদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব। তারপর, এই ঘর আপনাদের কাছে

যত তুচ্ছই হউক না কেন, আমার কাছে ইহার প্রত্যেক খড়কুটা-ধূলিকণা অতি পবিত্র। এই ঘর আর ধর্ম্ম-মন্দির আমার কাছে একরূপ। ইহা আমার স্বামীর স্মৃতি। কাজেই, স্বামীর ভিটা আর ঐ কবর আজ আমার কাছে সব চেয়ে বড়।"

আমার দাদা টমাসের বয়স তখনো এগারো বৎসর হয় নাই। তিনি মাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া দিন কয়েকের ভিতর সংসারের এবং চাষের সমুদয় কাজ একলা করিতে লাগিয়া গেলেন। সমুদয় জমির উপর কিভাবে কাজ চালানো যায় তার নানা রকম উপায়-আলোচনা যখন চলিতেছিল, তখন জমির এক খরিদ্দার জুটিয়া গেল। মা আর দেরী না করিয়া নগদ দামে ষাট বিঘা জমি ছাড়িয়া দিলেন। এই টাকার শেষ কড়িটি দেনা-পরিশোধেই গেল। দেনার কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

আমার দাদা এক সহৃদয় প্রতিবেশীর একটা ঘোড়া আনিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যাস্তের পর পর্য্যন্ত খাটিয়া ধান গম এবং আলুর জমি চাষ করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাক-সব্‌জির জন্যও খানিকটা জমি তৈরী করিয়াছিলেন। যে কোনো লোক সেদিন তাঁহার এই কর্ম্ম-কুশলতা এবং সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। অবাক্ হইবারই কথা। কিন্তু আজ আর আমি সেটা তত বড় মনে করিনা। কারণ,

মা'র প্রয়োজন সাধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলের অন্তরেই চিরজাগ্রত রহিয়াছে। তাঁহার এই অপরিমিত পরিশ্রমের ফলে হেমন্তকালে ভারে-ভারে শস্য ঘরে আসিল।

মা গমের জমির চারিদিক বেড়া দিয়া ঘিরিবার জন্য জঙ্গল হইতে গাছ আনিয়া চিরিতে লাগিলেন। আমার দিদি, কখনো দাদাকে কখনো মাকে সাহায্য করিতেছিলেন। পাছে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে দাদা মারা যান, এই ভয়ে মা প্রাণপণে আবশ্যক কাজ কমাইয়া রাখিতে যাইয়া নিজে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। তথাপি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। নিজের মৃত্যু বরং ভালো, তবু কোনো মা-ই চোখের সামনে নিজের কুসন্তানের মৃত্যুও দেখিতে ইচ্ছা করে না।

হেমন্তকালে যে ফসল ঘরে আসিয়াছিল তাহা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল, অথচ প্রয়োজনের সময়ে খরিদ করার মতো টাকাও ছিল না। মা হিসাব করিয়া দেখিলেন, খাওয়া-দাওয়া যেভাবে চলিতেছে তাহাতে নূতন ফসল উঠিবার অনেক পূর্ব্বেই গোলা খালি হইয়া যাইবে। কাজেই, সন্তানদের কাছে কিছু না বলিয়া মা নিজের রাত্রির আহার বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি দিনে রাত্রে দুইবার মাত্র আহার করিতে লাগিলেন, অথচ তাঁহাকে খাটিতে হইতেছিল অত্যধিক পরিমাণে। কিছুদিন পর মা দেখিলেন তাঁহার হিসাবে গোল হইয়া গিয়াছে। কাজেই নিজের আর একবারের আহার

কমাইয়া দিলেন। এখন মাত্র একবার আহার করিয়াই তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন।

মা যে কত বড় তাহা আজও বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। স্নেহের প্রবাহ বোধ হয়, ঐ মাতৃমূর্ত্তির ভিতর দিয়াই সমুদয় জীবজগতে প্রবাহিত হয়। সেই প্রবাহ যে কত গভীর, কত বিশাল, কত দীর্ঘ, কত তার বেগ তাহা বোধ হয় মা নিজেই জানেন না। লাভ-লোকসান এবং জমা-খরচের কোনো অঙ্কই সেই হৃদয়-পাতে লেখা থাকে না।

এবারে আমাদের ভালো চাষ হইয়াছিল। অন্য কোনো আপদ না ঘটায় আমরা যথেষ্ট পরিমাণ উৎকৃষ্ট শস্য পাইলাম। আমাদের অভাব দূর হইল। এই লড়াইয়ে জয়ী হইয়া মা জোড়হস্তে ঈশ্বরকে জানাইলেন, "হে ভগবান, হে অনাথের নাথ, তুমি থাকিতে আমার আর ভাবনা কিসের"! অতঃপর আর কোনোদিন আমাদের ক্ষুধার ভাবনায় মাকে পাগল হইতে হয় নাই।

এই সময়ে আমাদের একঘর প্রতিবেশী দেখা দিলেন। দিন কতক পর মা খবর পাইলেন, জমি-চষা এবং সময়ে সময়ে কাঠকাটার জন্য তাহাদের একটী অল্পবয়স্ক চাকরের প্রয়োজন। মা'র জন্য টাকা রোজগারের একটা সুযোগ পাইয়া আমার দাদা তৎক্ষণাৎ সেখানে কাজে লাগিয়া গেলেন।

৩

দাদা নূতন প্রতিবেশীর চাকরী করিয়া প্রথম যেদিন টাকা লইয়া ঘরে আসিলেন, সেদিন আমাদের পরিবারে এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। কারণ, একে তো জঙ্গলে কাঁচা পয়সার মুখ দেখা কষ্টের বিষয় ছিলই, তার উপর আবার দাদার বয়স তখন মাত্র তেরো বৎসর। এতদিন অসম সাহসের সহিত অনেক কাজ তিনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজ রোজগারের এই টাকা তাঁহার যোগ্যতাটা শতগুণে বাড়াইয়া দিল। দাদা তাঁহার প্রথম রোজগারের টাকা মা'র হাতে দিয়া আমাকে একজোড়া জুতা তৈরী করাইয়া দিতে বলিলেন।

সেদিন টাকা এবং জুতা কি বস্তু তাহা আমি জানিতাম না, তবে এই দুইটি বস্তু লইয়া সকলেই যে একটা খুব আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

শৈশবে আমার তবু একজোড়া জুতা জুটিয়াছিল, কিন্তু আমার দাদা এবং দিদিরা খালি পায়েই কত শীত কাটাইয়া দিয়াছেন। খালি পায়ে কত কঠোর কাজ করিতে করিতে

পায়ের তলার চামড়া পুরু করিয়া জুতার অভাব তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কত দুঃখেই না তাঁহারা মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন!

কয়েক দিনের ভিতর আমার জুতা তৈরীর জন্য মুচি হাজির হইল। তখনকার দিনে মুচিরা দোকান খুলিয়া বসিত না। তাহারা খরিদ্দারদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া কাজ করিত। তাহারা যে পরিবারে যতদিন কাজ করিত সেই পরিবারের সঙ্গেই ততদিনের জন্য খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া লইত। কাজ শেষ হইয়া গেলে তাহার পাওনা টাকা হইতে খাই-খরচ শোধ করিয়া দিত। মুচিরা নিজ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল না। কাজেই একজোড়া জুতা তৈরী করিতে সময়ও লাগিত ঢের বেশী, আর জুতাও হইত না পছন্দসই। সৌন্দর্য্যের তুলনায় দাম বেশিই পড়িয়া যাইত। সৌন্দর্য্যের কথাটা সকল খরিদ্দারই আওড়াইত। ইহা ছিল একটা দস্তুর। জুতা পাইয়া আমি যে কি খুসি হইয়াছিলাম, তাহা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। ত্রিশ বৎসর পরে কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াও আমি ইহার চেয়ে বেশি খুসি হই নাই। আমার মনে হয়, সেদিনে আমেরিকার কোনো জঙ্গলী ছেলে একজোড়া জুতা পরিতে পাইলে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসনটার লোভও অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিত।

এই সময়ে একদিন আমার মা এবং ভাইবোনেরা শুনিলেন যে, মাইল দেড়েক দূরে একটা পাঠশালা বসিবে। সত্য সত্যই পাঠশালা বসিল। আমার লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ হইল দেখিয়া দাদারই নাকি সব চেয়ে বেশি আনন্দ হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয় যে কত উচ্চ তাহা মাপিবার শক্তি জেম্‌স্‌ আব্রাম গারফীল্‌ডের কোনো দিনই হয় নাই—যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হইবার পরেও নহে। শুনিয়াছি, সাংসারিক কাজকর্ম্মের জন্যই, আমার দাদার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, ইস্কুলে যাওয়া হয় নাই। সেদিন দাদা যে আমার জন্য কত বড় একটা স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছিলেন তাহা আমি আজ বুঝিতেছি। যে দরজা দিয়া বাহির হইয়া লোকের চোখে আমি এত বড় হইয়া দেখা দিয়াছি, সেই দরজার চাবিটা ছিল আমার দাদার হাতেই। জঙ্গল কাটিয়া, জমি চষিয়া, পরের বাড়ীতে চাকরী করিয়া তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, শত শত গ্রন্থ পাঠ করিয়াও বোধ করি মানুষ সেই শিক্ষার অধিকারী হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি তাঁহার দেশবাসীর নিকট হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ যে জয়ধ্বনি শুনিয়া আসিতেছেন, তাহার চেয়ে এই কাহিনী ঢের মধুর, ঢের গম্ভীর, ঢের আশাপ্রদ। দাদা আমাকে শুধু পাঠশালায় পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহার মনের সাম্‌নে এক দিব্য আলো জ্বলিয়া উঠিয়া বোধহয় আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা

দেখাইয়া দিয়াছিল। সেই জন্যই বহু লোকের নিকট শুনিয়াছি দাদা আমার সম্বন্ধে আমার ছোটবেলা হইতেই অনেক উচ্চ আশা মনে মনে পোষণ করিতেন।

মনে আছে, নানা রকম প্রশ্ন তুলিয়া মাকে বিরক্ত করিতাম। কিন্তু মা কোনোদিনই বিরক্ত হইতেন না। মা আমার প্রত্যেক কথার জবাব দিতেন। বড় হইয়া মা'র কাছে শুনিয়াছি ছোট ছেলেদের কথার জবাব না দিলে কিংবা বিরক্ত হইলে তাহাদের ক্ষতিকরা হয়, এবং ইহাতে মানব-সমাজের ক্ষতিই নাকি হয় বেশি। ইস্কুলে যাওয়ার পূর্ব্বে আমি মা'র নিকট বাইবেল শিখিয়াছিলাম। খুব অল্পদিনেই বাইবেল আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল।

আমার বয়স তখন সাড়ে তিন বৎসর। কাজেই দাদার আর এক ভাবনা আসিল, কি করিয়া এতখানি পথ হাঁটিয়া আমি ইস্কুলে যাইব! প্রথম দিন আমি দিদির পিঠে চড়িয়া বেশ আরামেই বিদ্যালাভ করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের ভাই-বোনদের ভিতর দিদিই ছিলেন সব চেয়ে বড়। ইস্কুল হইতে ফিরিবার সময়ও দেড় মাইল পথ দিদির পিঠে চড়িয়াই আসিয়াছিলাম। যে কয়দিন এই পাঠশালায় যাওয়া-আসা করিয়াছিলাম সেই কয়দিন দিদির পিঠই ছিল আমার একমাত্র ভরসা।

মাকে কোনোদিনই বৃথা সময় নষ্ট করিতে দেখি নাই।

অত্যন্ত পরিশ্রমের পরেও দিনের বেলায় তাঁহাকে কখনোও ঘুমাইতে দেখি নাই। মা আমাদের মঙ্গলের জন্যই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, অনেক হিসাব করিয়া চলিতেন।

মাকে সময় নষ্ট করিতে দেখিলে পাছে আমাদের চরিত্রেও ঐ সব দোষ দেখা দেয়, এই ভয়ই ছিল মা'র সব চেয়ে বেশি। দেশের এবং সমাজের ভালোমন্দ যে আমাদের উপর অনেকখানি নির্ভর করে, তাহা তিনি কোনোদিনই ভুলেন নাই। আমাদের ভালো-মন্দর জন্য যে তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী, একথা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগিয়া থাকিত। সেইজন্যই কোনোদিন তাঁহার শাসনে শৈথিল্য দেখি নাই।

দিনের বেলায় অন্যান্য কাজ শেষ করিয়া মা চরকা লইয়া বসিতেন। এইভাবে তিনি আমাদের পরিবারের কাপড়-চোপড়ের অভাব দূর করিতেন। আমাদের ঘরে একটা তাঁতও ছিল। তখনকার দিনে এই সকল পরিবারে চরকা ও তাঁত আবশ্যক জিনিষের মধ্যেই গণ্য ছিল। বিশেষতঃ কলকজার তখনো শৈশব অবস্থা চলিতেছিল।

সাধারণতঃ "বাঘ-ভালুক প্রভৃতি শিকারী জানোয়ার," "মহাসমুদ্রে ঝড়-ঝাপ্টার ভিতর নাবিকদের জীবন-রক্ষার কাহিনী," এবং "গুণ্ডা ও জলদস্যুদের দুঃসাহসিক কার্য্যাবলী" লইয়াই তখনকার দিনের বইগুলি লেখা হইত। এক একখানা ছবি দিয়া বইয়ের বিষয়গুলি মনোরম করিবার চেষ্টাও করা

হইত। পড়াশুনার দিকে আমার মা'র অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। সেই গুণটীর কতকাংশ আমরাও পাইয়াছিলাম। নেকড়ে এবং চিতা-বাঘের দেশে পুঁথি-পত্রের সাক্ষাৎ পাওয়াটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করিত। সেইজন্যই কোনো নূতন বইয়ের সন্ধান পাইলে যেমন করিয়াই হোক্ মা তাহা কিনিয়া ফেলিতেন।

মাস কয়েক পাঠশালায় যাতায়াত করিবার পর শীতের জন্য পাঠশালা বন্ধ হইয়া গেল। অত্যন্ত শীত ছিল বলিয়া পরেও আমার আর যাওয়া হয় নাই। আমাকে এবং দাদাকে মা বাড়ীতে পড়াইতেন। পাঠশালায় যাইতে না পাইয়া আমার খুবই কষ্ট হইয়াছিল। ইস্কুলে আমিই ছিলাম সব চেয়ে ছোট। কাজেই, শিক্ষক এবং ছাত্ররা যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

শীতের সন্ধ্যায় অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়া পড়িতে বেশ ভালো লাগিত। সমস্ত ঘরে দিনের বেলার মতো আলো পাওয়া যাইত, আবার ঘর গরম থাকিয়া বেশ আরাম দিত। মোমবাতি অথবা তেলের প্রদীপ জ্বালাইবার কোনো সুবিধা ছিলনা। শীতকালে অগ্নিকুণ্ডের আলোর উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইত। আগুনের তাপে দোতলার মেজে পর্য্যন্ত গরম হইয়া যাইত। এই সময় পড়ার নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মা নাকি তখন খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আমার শিক্ষালাভের প্রশস্ত ক্ষেত্র আমি পাইবই।

৪

আমার বয়স তখন বৎসর পাঁচেক। দূরে পাঠাইতে নানা রকমের অসুবিধা দেখিয়া মা আমার জন্যই নিকটে একটা ইস্কুল বসাইতে চাহিলেন। মা যখন যাহা কিছু বলিতেন তাহা বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিতেন, এবং মুখ হইতে যে কথা একবার বাহির হইত তাহা ছিল বিধাতার রেখ। দিন কতক পরে আমাদের গমের জমির কোণে একটা ইস্কুল ঘর তৈরী হইয়া গেল। মা'র বন্দোবস্ত অনুসারে একজন শিক্ষকও আসিয়া পড়িলেন। পালা অনুসারে প্রতি-ছাত্রের বাড়ীতে শিক্ষক মহাশয়ের খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত হইল। শিক্ষক মহাশয়ের কয়েকটী গুণ ছিল, যাহা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। তাঁহার সচ্চরিত্রতা, সহৃদয়তা এবং ছাত্রের হিতাকাঙ্ক্ষা সত্য সত্যই অতুলনীয় ছিল। কেমন করিয়া যে তাঁহার ছাত্রদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র সাধনা। সর্ব্বপ্রথম তিনি আমাদের পরিবারেই রহিলেন এবং আমার দাদা ও আমাকে সঙ্গে লইয়া দোতলার মেজেতে ঘুমাইতেন।

প্রথম দিন ইস্কুল যাইবার সময় শিক্ষক মহাশয় আমার

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "জেম্‌স্‌, তুমি ভালো করিয়া লেখা-পড়া কর, জেনের‍্ল্‌ হইতে পারিবে"। জেনের‍্ল্‌টা কি বস্তু তাহা আমি জানিতাম না। তথাপি মনে ভাবিলাম, একটা খুব বড় এবং ভালো কিছু হইবেই, তাহা না হইলে শিক্ষক-মহাশয় এতটা আদর করিয়া আমাকে একথা বলিতেন না। বাড়ী আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা জেনের‍্ল্‌ কি"? জেনের‍্ল্‌ শব্দের ব্যাখ্যা শুনিতে যাইয়া জানিতে পারিলাম, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আমেরিকার স্বাধীনতা-লাভের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। যাহা হোক, সেদিন স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাস মা এত সুন্দর ভাবে আমাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, অতঃপর বই পড়িয়া তাঁহার বর্ণনার কোনো খুঁৎ পাই নাই। বর্ণনার শেষে মা বলিলেন, "আর জেনের‍্লের কাজ নাই বাবা! জেনের‍্ল্‌দের হুকুমেই মানুষ মানুষের বুকে মরণ-আঘাত করে। তুমি লেখাপড়া শিখিয়া জেনের‍্ল্‌দের মতো বড় হও, তাঁহাদের মতো সম্মানিত হও, মানবজাতির মঙ্গল কর।"

ইস্কুলে পড়াশুনা বেশ চলিতে লাগিল। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের চোখে আমার স্বভাবের উপর একটা বড় রকমের দোষ ধরা পড়িল—আমার দুই কান আর দুই চোখের অমনোযোগ সম্বন্ধে। শিক্ষক মহাশয়ের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও আমার দুই চোখ আর দুই কানকে আমি কিছুতেই বাগ

মানাইতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু আমি চেষ্টা করিতে ত্রুটী করি নাই। শেষ পর্য্যন্ত ভালো ছেলে হইবার জন্য অনেক কষ্টে যদিই বা আমার চোখ-কানকে সায়েস্তা করিলাম তো পড়ায় আর মন বসিত না। আমি যেন কতকটা বেকুব বনিয়া গেলাম। পড়া-শুনায় আর পূর্ব্বের মতো আমার উৎসাহ রহিল না। বাড়ীতে যাহা শিখিতাম, ইস্কুলে গেলে তার একবর্ণও মনে থাকিত না।

আমাদের বাড়ীর পালা শেষ হইলে শিক্ষক মহাশয় অন্য বাড়ীতে যাইবার সময় আমার সাম্‌নে মাকে বলিলেন, "আপনার প্রাণে আঘাত দিতে ইচ্ছা করি না—, জেম্‌স্ ছেলে ভালো, কিন্তু—"। এই "কিন্তু" শুনিয়া মা'র মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। আমি ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলাম। মা অস্থির হইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন "বলুন, বলুন"। শিক্ষক মহাশয়, "বলা উচিত," "আমার কর্ত্তব্য" ইত্যাদি নানা রকমের ভণিতা করিয়া শেষে এই বলিয়া মাকে আশ্বস্ত করিলেন যে, "জেম্‌স্ ইস্কুলে স্থির হইয়া বসে না এবং পড়াও বলিতে পারে না। আমার সকল আশা জাহান্নমে যাওয়ার অবস্থা।" গুলি খাইলে লোকে যে রকম চীৎকার করে, শিক্ষক মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া মা-ও ঠিক সেই রকম "হাঁরে জেম্‌স্" বলিয়া এক চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। সেই দিনের সমুদয়

ব্যাপার আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আজ বুঝি, মা সেদিন কেন এই রকম চীৎকার করিয়াছিলেন। মাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার কোলে মুখ লুকাইয়া আমিও কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম। মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আর কোনো উপায় না পাইয়া বলিলাম, "মা, তুমি কাঁদিও না, আমি ভালো হইব।"

এই অস্থিরতা আমার জন্মগত। কাজেই মা আমার উপর কোনো জোর খাটোনো অকর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বের মতো আমার ভাবে চলিতে লাগিলাম। আবার স্বাভাবিক ভাবে পড়াশুনায় আমার উৎসাহ জন্মিল। মা নিশ্চিন্ত হইলেন। শিক্ষক মহাশয় আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন।

যে অস্থিরতা লইয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, জীবনে একটা দিনও সে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। ছোটবেলায় ঘুমের ভিতর লাথি দিয়া গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিতাম, তারপর বিছানাময় একটা তাণ্ডব নৃত্য চলিত। দাদাকে ঘুমের ভিতর কত কষ্টই না দিয়াছি! শীতে যখন খালি গায়ের রক্ত জমিয়া আসিতে থাকিত তখন ঘুমের ভিতর দাদাকে বলিতাম, "টম্ ঢেকে দাও তো"। দাদা নিজের ঘুম ভাঙ্গিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে ঢাকিয়া দিতেন। ত্রিশ বৎসর পরে নিগ্রো-স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়ে এক রাত্রির

ভয়ানক যুদ্ধের পর আমি আমার কর্ম্মচারীদিগের সহিত একত্র ঘুমাইতেছিলাম। ছোটবেলার সেই অস্থির অভ্যাসের ফলে লাথির চোটে আমার গায়ের কাপড় সরিয়া যায়। শীত বোধ হইতেই বলিয়া উঠিলাম, "টম্ ঢেকে দাও তো"। একজন কর্ম্মচারী ঢাকিয়া দিতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণাধিক ভ্রাতা এবং ওহায়োর 'লগ ক্যাবিনে'র কথা মনে পড়িতেই আমার চোখের জলে মাথার নীচে যাহা ছিল ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

যাহা হোক, অতঃপর পাঠশালার শিক্ষক মহাশয়ের নিকট একখানা বই পুরস্কার পাইয়াছিলাম। একটী মাত্র পুরস্কারই তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেদিন মা'র চোখে আনন্দের অশ্রু দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। মা'র কাছে আমার প্রতিশ্রুতির দাম বাড়িয়া গেল।

এই সময়ে চাষের কাজে দাদাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতাম মাত্র। তখন আমার বয়স ছিল বারো বৎসর। কাজেই শক্তি ও যোগ্যতার তুলনায় শুধু ইচ্ছাটাই ছিল প্রবল।

৫

দাদা আমাদের চাষের কাজ-কর্ম্ম আমাকে বুঝাইয়া দিয়া নিজে টাকা রোজগারের জন্য প্রতিবেশীদের কাজে যাইতেন। দাদার মতো চাষের কাজে ওস্তাদ হইবার ইচ্ছা আমার আগে হইতেই ছিল। এখন সেই সুযোগ জুটিয়া গেল। আমি পাকাপাকি ভাবে চাষের এবং গেরস্তির কাজে লাগিয়া গেলাম। আমার বয়স তখন আট বৎসর। কাজেই, আমার কাজ ছিল, রান্নার জন্য কাঠ-কাটা, গাভী-দোহন করা শস্য-ঝাড়াই করা এবং শাক-সবজির চাষ করা। এই সব বাদে সংসারের আরো কাজ ছিল। দাদার টাকা রোজগারের প্রয়োজন যে শুধু আমাদের সংসারের জন্যই ছিল, তাহা নহে। আমাদের পরিবারের পড়ার বই, শিক্ষকের বেতন এবং ইস্কুল-ঘরে সময়ে সময়ে সভা-সমিতিতে খরচের জন্যই টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমার কাজ দেখিয়া মা খুব খুসি হইলেন। মা আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিতেন, "এখন তোমাকেই সব কাজ-কর্ম্ম করিতে হইবে, তোমার দাদা টাকার জন্য বিদেশ যাইবে।" আমি কোনোদিনই পিছু হটিয়া যাওয়া পছন্দ

করি না। মা আমাকে বলিতেন, "কাজ করিতে করিতেই মানুষ ওস্তাদ হয়"।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশের সময় মা বলিলেন, "সর্ব্বদা নিজের উপর বিশ্বাস রাখিও। আর মনে রাখিও, যে কাজের ভার তোমার উপর রহিয়াছে, তাহা শেষ করিবার জন্য তুমিই দায়ী। যাহারা শুধু নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কাজে লাগিয়া যায়, ভগবানের অনুগ্রহ এবং সাহায্য পায় তাহারাই। তারপর, শুধু কাজ করিয়া গেলেই হয় না, কাজটী নিখুঁৎ হওয়াও চাই। যে কাজ হাতে লইবে, তাহাতে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলেই কাজটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। বেগারের কাজ কখনো ভালো হইতে পারে না। একবার ভালোভাবে কাজ শেষ করিবার অভ্যাস হইয়া গেলে, পরে নিজেই তার ফল বুঝিতে পারিবে। এই রকমে চলিলে কিছুদিন পর দেখিবে, তুমি নিজে হাত না দিলে কোনো কাজই সুন্দর হয় না। নিজে মানুষ হওয়ার এবং পরকে মানুষ করার, সকল দেশে সকল সমাজে, এই একই নিয়ম।"

মা'র এক-একটা কথা আমার নিকট মন্ত্রের মতো শক্তি-মান মনে হইত। যখন যে রকম উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইত, মা তখন ঠিক সেইটী আমার মনের সাম্নে

ধরিয়া দিতেন। মা'র উপদেশ মতো চলিয়া আমি কখনো ঠকি নাই।

এই সব উপদেশই ছিল আমার একমাত্র ভরসা। আমাকে তুলিয়া ধরিবার জন্য কেহ কখনো হাত বাড়ায় নাই এবং পরের কাঁধে চড়িয়া বড় হইবার সাধও আমার কোনো কালে ছিল না। অনেক ছেলেই জীবনে উন্নতির জন্য তাহাদের বড় মানুষ বাপ-খুড়া, মামা ও ভগিনীপতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যদি সংসারে দাঁড়াইতে হয় তো নিজের চেষ্টায় নিজের শরীর এবং মাথা খাটাইয়াই বড় হইব। আমি বুঝিয়াছিলাম, আমার সামনে যেমন কঠোর কর্ম্ম রহিয়াছে, তাহার মজুরীও রহিয়াছে তেমনি মোটা রকমের। ইহার অধিক আমি আর কিছুই চাহি নাই। তাই আজ আমি আমার যুবক বন্ধুগণকে বলিতেছি, "বন্ধুগণ, সুযোগ কখনো আপনি ধরা দেয় না। যদি তোমরা উহাকে পাকড়াও করিয়া, রস নিংড়াইয়া তোমাদের কাজে লাগাইতে চাও, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তোমাদের শরীর-মন-চোখ-কান সতেজ কর—সর্ব্বদা হুঁশিয়ার থাক। এই সংসার একটা ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র—দশ-বিশ বৎসরেও এখানকার যুদ্ধ শেষ হয় না। বাঁচার মতো বাঁচিতে হইলে, তোমাদিগকে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে হইবে। কাজেই, সে

জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাদিগকে নবনব বল, নবনব কৌশল সংগ্রহ এবং আবিষ্কার করিবার জন্য কঠোর সাধনা করিতে হইবে।

"যদি কখনো কোনো কাজের সফলতা তোমার নিজের শক্তি দ্বারা লাভ কর, তাহা হইলে তুমি যে আনন্দ পাইবে, অপরের দেওয়া সুখে সে আনন্দ কখনো পাইতে পার না। 'আপাতমধুর জিনিষ কখনোই মনোরম নয়।' যেখানে বেদনা যত বেশি, পরিণামে সুখ এবং আনন্দ পাওয়া যায় সেখানেই ততখানি। জীবনের আনন্দকর যাহা কিছু, তাহা নিজের চেষ্টায় লাভ করিলে তাহার মালিক হইবে তুমিই, এবং লব্ধ বস্তু তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই মতো প্রিয় বোধ হইবে।

"দারিদ্র্যকে তোমার চলার পথে কখনো বাধা সৃষ্টি করিতে দিও না। সে যে কি বস্তু তাহা আমার অজানা নাই। গ্রহাদির প্রভাবে মানুষ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দুঃখভোগ করে, কিন্তু ইহার প্রভাবে মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভা-শিক্ষা চিরজীবনের জন্য আবর্জ্জনার তুল্য হইয়া যায়। এইজন্য ভাবিত হইবারও কিছু নাই। যে বস্তু না হইলে আমাদের চলেনা, তাহাকে পাইবার জন্য বারবার আমাদিগকে লড়িতে হইবে। দশবারের ভিতর নয়বার বিফল হইলেও দমিয়া যাওয়া ঠিক নয়। কারণ বারবার শেষবারের

সফলতাই সকল ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে। কিন্তু সফল হওয়া চাই। আমার স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতেই আমি বলিতেছি, সংসারে যাহার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন আছে, এমন লোক কখনো ডুবিয়া মরিয়াছে একথা আমি শুনি নাই। যে যুবকের ভিতরে নানা রকম সদ্‌গুণ রহিয়াছে, জগতকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, সে যে চিরদিন অপরের হুকুম তামিল করিতে থাকিবে, ইহা ঠিক নয়। তাহাকে হুকুম-দার হইতে হইবে। তোমরা চিরদিন অপরের গোলাম হইয়া না থাকিয়া যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হইবার জন্য তৈরী হও। এই সংসারে পিছু হটিয়া গিয়া আত্ম-রক্ষার নামই মৃত্যু। বন্ধুগণ, জগতে এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহাকে তুমি হুকুম করিয়া চালাইতে পার—বাহির হও, খুঁজিয়া লও সেই বস্তুটী। যদি আর কিছু না-ই পাও, অন্ততঃ একজোড়া বলদ ধরিয়া মালটানা গাড়ী চালাইতে লাগিয়া যাও। বসিয়া বসিয়া জাঁকালো স্বপ্ন দেখার চেয়ে একটা গরু বা ঘোড়ার উপরই তোমার কর্ত্তৃত্ব চালাইতে লাগিয়া যাও। ভিতরে ইচ্ছা থাকিলে এই উপায়েই নিজের বড় হইবার পথ পাইবে।”

এই সময়ে মদ্যপানের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সুরু হয়। নিউ-ইংল্যাণ্ড-ষ্টেটই এবিষয়ে পথপ্রদর্শক। সেখান হইতে তড়িৎ বেগে এই আন্দোলনের ঢেউ আমাদের উত্তর-

পূর্ব্ব ওহায়োতেও আসিয়া লাগে। আমার মা সর্ব্বদা এই আন্দোলনের উপকারিতা লোকের নিকট প্রচার করিতেন। অন্যদিনও বাদ যাইত না, তবে সব চেয়ে তাঁহার বেশি সুবিধা হইত রবিবারে ধর্ম্ম-মন্দিরের উপাসনার পর। আমি একদিন মাকে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। মা বলিলেন, "মাতলামো করা ভয়ানক পাপ। সেই জন্যই সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মদ্যপান বন্ধ করিবার জন্য লোকের দুয়ারে দুয়ারে বলিয়া বেড়াইতেছেন।" সেদিন মদ সম্বন্ধে মা'র কাছে দুইটী নূতন কথা শুনিয়াছিলাম,—"একমাত্র মাতালের মুখেই মদ ভালো লাগে," আর "যদি একবার মাত্র কেহ মদ মুখে দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, ঐ একবারের জন্যই লোকে তাহাকে মাতাল বলিবে।" "মদ মাতালদিগকে গলা হইতে নীচের দিকে কাঁকড়া বিছার মতো হুল ফুটাইতে থাকে। যদি বড় হইতে চাও, যদি শিক্ষা দিয়া লোককে মানুষ করিতে চাও, তাহা হইলে মদ কখনো ছুঁইও না। মদ্যপায়ী কোথাও সম্মান পায় না। মদ্য পান করিয়া লোকে শরীরে মনে ও অর্থে যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়াও তেমন হয় না।" অতঃপর আর কোনোদিন মদের উপকারিতা জানিবার জন্য পাগল হই নাই। মদের পরিবর্ত্তে মা'র কথামতো দুধ এবং জলই বরাবর পান করিয়া আসিয়াছি।

মা এ সম্বন্ধে আরও অনেক জানিতেন। আমি তখন ছোট ছিলাম বলিয়াই বোধহয়, আমাকে আর বেশি কিছু বলেন নাই। যাহা হোক, মদ্যপানের বিরুদ্ধে সেদিন কোনো কাজ করিতে না পারিলেও, অন্তরে অন্তরে উহাকে ঘৃণা করিতে শিখিতেছিলাম। মা সেদিন বলিয়াছিলেন—"অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কখনো ভয় পাইও না। সংসারে সেই সব চেয়ে বড় ভীরু, বড় পাপী, যে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে না।" মনে আছে, আমি এই কথা অন্তরে অন্তরে আঁকিয়া লইয়া মাকে বলিয়াছিলাম, "ন্যায়ের পক্ষ লইতে মানুষে কেন ভয় পাবে মা?"

৬

আমার দাদা পয়সার জন্য দেশ-বিদেশে দিন-মজুরী করিতেছিলেন। ক্লীভ্ল্যাণ্ডের কাজ শেষ করিয়া বাড়ী আসিয়াই মিশিগান যাইবার জন্য তৈরী হইলেন। সেই সময় মিশিগানের দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিতেছিল। তখন অন্য কাজের চেয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্যই মজুরের বেশি প্রয়োজন হইত। দাদা ৩৬৲ টাকা দরমাহা পাইবে শুনিয়া, এক সঙ্গে অতগুলি টাকা এবং দাদার বাহাদুরীর কথা ভাবিয়া, আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না।

দাদা ৬।৭ মাসের জন্য অতি দূর দেশে, তাও আবার নিবিড় জঙ্গলে, চলিয়া যাইতেছে জানিয়া আমি অন্তরে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলাম। নিবিড়-জঙ্গলে, তাঁহাকে কল্পনা করিতে করিতে নানা দুর্ভাবনা মনে উঠিয়া আমার বুকটাকে যেন চাপিয়া ধরিতেছিল। আমার মা'র স্নেহ অন্য মায়েদের চেয়ে কিছু কম ছিল না। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবিতও দেখি নাই। মা বলিতেন, তাঁহার সন্তানেরা ভগবানের আশ্রিত। আমি চিরদিনই ঈশ্বরে তাঁহার এই অটল বিশ্বাস দেখিয়া আসিতেছি।

মা'র জন্য একখানি সুন্দর ঘর তুলিবার ইচ্ছা, আমার দাদার মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দাদার মিশিগান যাইবার প্রধান কারণ ছিল উহাই। ভালো ঘরের কথা শুনিয়া আমি খুবই খুসি হইয়াছিলাম। বারো বৎসর কুঁড়ে ঘরে বাস করিয়া করিয়া, উহা আমার আর মোটেই ভালো লাগিতেছিল না। ইতিপূর্ব্বে পাঁচ বৎসর কাল সুচারুরূপে সংসার চালাইয়াও আমার দাদা নূতন ঘরের জন্য সকল জিনিষই সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত অনেক সময়েই নিজে চাষের কাজ-কর্ম্ম চালাইয়াছি। কিন্তু এখন চাষের এবং অন্যান্য কাজের পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপরই পড়িল। আমি কোনোদিনই কাজ দেখিয়া ভয় পাই না। নিজের উপর আমার চিরদিনই একটা অটুট বিশ্বাস আছে। দাদা নিজের চেয়ে আমাকে বেশি কাজের লোক মনে করিতেন, তথাপি যাইবার সময় নানা রকম উপদেশ দিয়া গেলেন। কাজকর্ম্মের কোনো ক্ষতি হইল না সত্য, কিন্তু দিনের পর দিন তাঁহার অদর্শন যেন আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল।

শক্ত কাজকে আমি কোনোদিনই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতে চাহি না। এমন অনেক ধনী আছেন, যাহারা এক টাকাকে তিন টাকা করিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বহু সময় পরিশ্রম করেন,

এবং উহার ফলে যথেষ্ট লাভবানও হয়েন ; অথচ সেই সময়টাই আবার লক্ষ লক্ষ গরীবের শুধু হাড়-মাংসের যোগা-যোগ রাখিবার জন্যই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গরীবের প্রত্যহ এই উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফল খতিয়ান করিলে দেখা যায়, শ্রমে তাহার বিরক্তি জন্মিতেছে ; স্নায়ু সকল অবসন্ন হইয়া আসিতেছে ; যে নিদ্রার কোলে আশ্রয় লইয়া একদিন সে এই জগতে আসিয়াছিল, সেই নিদ্রা তাহাকে জনমানব-হীন প্রান্তরে যেন একলা ফেলিয়া সরিয়া পড়িতেছে ; ধারণা-শক্তি লোপ পাইতেছে ; আর সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হইতে হইতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। দরিদ্রের হিসাবের খাতায় জমার ঘরে শূন্য বলিয়াই ধনী-দরিদ্রের ভিতর এতখানি ফারাক্।

দাদা চলিয়া যাইবার পর হইতে ক্রমাগত কঠোর পরি-শ্রমের সুযোগ পাইয়া আমি যতটা আনন্দিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্ব্বে আর কখনো ততটা হই নাই। আমার উপর কাজের দায়িত্বও ছিল যথেষ্ট। দায়িত্ব আর হাড়ভাঙ্গা-খাটুনি এক বস্তু নয়। আমার কাজের ভাবনা কি স্বপনে, কি জাগরণে, কোনো সময়েই আমাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারে নাই। দায়িত্ব ছিল বলিয়া আমি সর্ব্বপ্রকারে ইহাতে আনন্দই পাইতেছিলাম। চাষের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পাইয়া একই সময়ে যোগ্য মানুষ এবং দক্ষ কর্ম্মীরূপে আমি গড়িয়া

উঠিতেছিলাম। এই জন্যই পরিশ্রম আমার চোখের সাম্‌নে এক সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি জীবনে কখনো ইহার বেদনাতুর শীর্ণ মূর্ত্তি দেখি নাই। অসন্তোষ কোনোদিনই আমার অন্তরে আস্তানা গাড়িতে পারে নাই।

দরদ না থাকিলে কোনো বস্তুই গড়িয়া উঠিতে পারে না। অবশ্য সেই দরদটা আসে যে কোনো রকমের একটা স্বার্থের দিক হইতেই। আমি মানুষ হওয়ার জন্যই আমার কর্ম্মকে আকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। বড় মানুষ হইবার বাসনা আমার কোনোদিনই ছিল না। আমার উদ্দেশ্য অন্য সাধারণ পাঁচজনের মতো ছিল না বলিয়াই, আমার নাক-মুখ-চোক-কান উহাদের নিজ নিজ প্রয়োজন বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। পাঠশালার শিক্ষক মহাশয় ছাত্রের জন্য যে রকম যত্ন লইয়া থাকেন, আমার কৃষি হইতেও আমি তার চেয়ে কম উপকার পাই নাই। আমাদের ভিতর যেন গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। একটা উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারিবেন, কর্ম্মের কাছে শিষ্যের মতো জিজ্ঞাসু হইয়া থাকিলে কি রকম সুফল ফলে।

লোকোমোটিভ এঞ্জিনের আবিষ্কর্ত্তা জগদ্‌বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন্‌ বলিয়াছেন, তিনি কল-বিজ্ঞান শিখিয়াছিলেন তাঁহার এঞ্জিনের নিকট—ইস্কুল-কলেজে যাইয়া শিক্ষকের নিকট নহে। সত্যই, তিনি ছিলেন ছাত্র আর

তাঁহার এঞ্জিন ছিল তাঁহার শিক্ষক। তিনি যেমন প্রতিদিন প্রকৃত জিজ্ঞাসুর মতো ব্যাকুলহৃদয় হইয়া উপস্থিত হইতেন, এঞ্জিনও তেমনি গুরুর মতো প্রতিদিন তাঁহাকে নূতন নূতন পাঠ অতি সরল সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিত।

জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সনের বয়স তখন আঠারো বৎসর। তিনি কোনো এক কয়লার খনিতে এঞ্জিন চালাইবার কাজে বহাল ছিলেন। শনিবার বৈকালে ছুটীর পর শ্রমিকেরা চলিয়া গিয়া যখন নিকটবর্ত্তী তাড়ির দোকানে মজলিশ জমাইয়া তুলিত, অথবা প্রাণমন ঢালিয়া কুকুরে-কুকুরে লড়াইয়ে উৎসাহ দিতে থাকিত, জর্জ্জ তখন এঞ্জিনখানাকে আগাগোড়া খুলিয়া পরিষ্কার করিতে বসিতেন; এবং কোন্ অংশ দ্বারা কি কাজ হয় তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। ঐ বয়সেও তিনি লিখিতে কিংবা পড়িতে পারিতেন না বটে, কিন্তু জড়-এঞ্জিনের প্রাণের সকল কথা বেশ ভালোরূপেই বুঝিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, ঐ এঞ্জিনই তাঁহার শিক্ষক,—তাঁহার কৃতিত্ব তাঁহার শিক্ষকের ঐকান্তিকতার ফল।

আজ সেই জগদ্‌বিখ্যাত মনিষীর কথার সঙ্গে আমার নিজের কথাটা মিলাইয়া বলিতেছি, আমার কৃষিই ছিল আমার শিক্ষক। আমি তাহার নিকট নানা প্রকারের সুশিক্ষা পাইয়াছি। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,

কি শারীরিক, কি মানসিক সকল দিক দিয়াই, ঐ বৎসরে চাষের কাজ করিয়া আমি যতটা উন্নত হইয়াছিলাম, ইস্কুলে গেলে কিছুতেই ততটা হইত না। আমার মনে হয়, এই ভাবে বাল্যকাল হইতে হাতে-কলমে কাজ করার ফলে, জীবন-সংগ্রামের জন্য মানুষ যেমন গড়িয়া উঠিতে পারে, গতানুগতিক ভাবে পাঠশালায় গিয়া ঠিক তেমনটী হয় না। সত্য সত্যই, এই সময়ে আমার তথাকথিত জ্ঞান-পিপাসা প্রায় দূর হইয়া গিয়াছিল।

সময় সময় লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছাটা আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। ভাবিতাম ইহা অসম্ভব—"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"—বিশেষ, আমেরিকান্ জঙ্গলের গরীব চাষা আমার পক্ষে! আমার মা'র কিন্তু দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, আমার লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ হইবেই। তাঁহার কথা শুনিয়া মনে মনে বলিতাম, এমন দিন কি হইবে, যেদিন তিন পুরুষের চাষী গার্‌ফীল্ড, জগতের কোনো কল্যাণে আসিবে! আমি নিজের জন্য কোনোদিনই বড় হইতে চাহি নাই। আমার মা'র জন্যই মাকে কেন্দ্র করিয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধির দিকে সর্ব্বদা ছুটিয়া যাইতেছিলাম।

৭

তখনো আমেরিকার জঙ্গলী অঞ্চলে ডাক-বিভাগের বন্দোবস্ত হয় নাই। কাজেই দূর দেশ হইতে পরিচিতের, আত্মীয়ের খবর দেওয়া-নেওয়া মোটেই সম্ভবপর ছিল না। আজ যে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, যদি সে আবার কোনোদিন ফিরিয়া আসে, তবেই তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, ইহাই ছিল তখনকার দিনের ব্যবস্থা। বিদায়ের দিন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন পর্য্যন্ত কালের ব্যবধান যদি সুদীর্ঘ হইত তাহা হইলে সেই সময়টা আত্মীয়-স্বজনকে নীরব বেদনার বোঝা বহিয়াই কাটাইতে হইত। এই ভাবে যখন আমরাও দাদার অভাবে দিন কাটাইতেছিলাম, তখন এক সুপ্রভাতে হঠাৎ আমার দাদাকে বাড়ীর দিকে আসিতে দেখিলাম। দাদাকে দেখিয়া যত জোরে পারিয়াছিলাম আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। আমি দৌড়িয়া গিয়া দাদার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। আপনারা হয়তো বারো তেরো বৎসর বয়সে ঐ ভাবে আমার দৌড়িয়া যাওয়ার কথা

শুনিয়া হাসিবেন, কিন্তু আমার কাছে একাধারে তিনিই যে ছিলেন আমার ভ্রাতা, বন্ধু ও সখা !

দাদা বিষম জোরে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। জীবনের বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভালোবাসার এক-একটা স্মৃতি আজিও আমার কাছে সেই প্রথম দিনের মতো তাজা হইয়া রহিয়াছে। তেমন ভালোবাসা আর কোথাও পাই নাই। আমি দাদার হাত ধরিয়া ধরিয়া চলিলাম। পথ চলিতে চলিতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের বেশ ভালো ঘর হবে এখন ?"—"নিশ্চয়ই হবে।" "কেন, তোমার কি আর ঐ ঘর ভালো লাগে না ?" "জবাব দিলাম, "না।"

দাদা বাড়ীর কাছাকাছি হইতেই মা ও দিদিরা ছুটিয়া গিয়া দাদাকে জড়াইয়া ধরিলেন। দীর্ঘ সাত মাস পর সেদিন আমরা যে কি আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবে না। মা, দাদার সেখানকার খবরাখবর লইতেছেন এমন সময়ে দাদা একমুঠা সোনার টাকা মা'র কোচড়ের উপর ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মা, এখন একটা ভালো ঘর তৈরী করে ফেলো। এঘরে জিমির বড্ড কষ্ট হচ্ছে।" দাদা মা'র জন্য একটা কাজের মতো কাজ করিতে পারিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। এতগুলি টাকা তাও আবার সোনার—এক

সঙ্গে দেখিয়া আমি যারপরনাই অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাদা, এখানে কত টাকা ?" গম্ভীর ভাবে জবাব আসিল, "পঁচাত্তর"।—"সব তুমি নিজে খেটে করেছ ?"—"এর পাই-পয়সাটী অবধি আমার নিজের খাটুনির।" আর কিছু জিজ্ঞাসা করার না-পাইয়া, জোরে জোরে সেই চক্‌চকে স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত লেখাগুলি পড়িতে লাগিয়া গেলাম। ঐ টাকাগুলি আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

পড়া শেষ হইয়া গেলে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি, মা নীরবে একদৃষ্টিতে টাকার দিকে চাহিয়া আছেন, আর তাঁহার চোখ হইতে টশ্ টশ্ করিয়া জল পড়িতেছে। মা'র এই অবস্থা দেখিয়া আমি চুপ মারিয়া গেলাম। দিদির কাছে পরে শুনিয়াছিলাম, বাবার কথা, আমাদের অতীত দুঃখের দিনের কথা, বাবার মৃত্যুকালে দাদা নিতান্ত ছেলে মানুষ ছিলেন, আজ তিনি বিদেশ হইতে রোজগার করিয়া টাকা লইয়া আসিয়াছেন, ইত্যাদি সুখদুঃখের সকল ঘটনা একত্র হইয়া মা'র মন বিষম তোলপাড় করিয়াছিল।

আর দেরী না করিয়া ঘর তৈরীর জন্য ছুতার মিস্ত্রী ডাকা হইল। আমার জীবন-প্রভাতের আর এক প্রহর নবভাবে আমার সাম্‌নে দেখা দিল। এইবারে কর্ম্মজগতের সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এক পাঠশালায় নবীন ছাত্ররূপে

ভর্ত্তি হইতে পারিব ভাবিয়া আমার যারপরনাই আনন্দ হইল।

মিস্ত্রীর নাম ছিল মিঃ টীট্। লোকটী অত্যন্ত ভদ্র। আমি তাঁহার কাছে আমার কাজ শিখিবার ইচ্ছা জানাইতেই, তিনি খুসি হইয়া আমাকে কাজ পছন্দ করিতে বলিলেন। আমি দরজা তৈরীর জন্য হাতুড়ি-বাঁটালি-মাটাম লইয়া কাঠে-কাঠে জোড়া দিতে লাগিয়া গেলাম। একে একে ছয়টী শেষ করিয়া তাঁহার নিকট যথেষ্ট ধন্যবাদ পাইলাম। সেদিনে ঐ ধন্যবাদের মূল্য আমার নিকট খুবই বড় মনে হইয়াছিল। তারপর আমাকে রেঁদা করিতে বলিলেন। আমি নূতন কাজের ভার পাইয়া যারপরনাই খুসি হইলাম।

আপনারা মনে করিবেন না যে, আমি কাজের দিকে কোনো লক্ষ্য না-রাখিয়াই আগাইয়া যাইতেছিলাম। যে কোনো কাজে হাত দিবার সাহস আমার সর্ব্বদাই ছিল, এবং নূতন কাজে হাত দিলেও তাহা আমার কাছে পুরাতনের রূপেই দেখা দিত। কথাটা আর কিছুই নয়, আমার আশে-পাশে যখন যে কাজ চলিত আমি দেখামাত্র উহার প্রথম সূত্রটা বুঝিয়া রাখিতাম এবং সহজে তাহা বুঝিতেও পারিতাম। কোথাও বেকুব হওয়া আমি কোনোদিনই আদৌ পছন্দ করি না। আমার যুবক বন্ধুগণকে বলিতেছি, "কোনো কাজের

ভার কাহারো উপর পড়ুক আর নাই পড়ুক, চোখের সাম্‌নে যাহা কিছু ঘটে তাহার অন্ধি-সন্ধি এবং রীতি-নীতি জানিয়া রাখা উচিত। কখন কোথায় কোন্ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এইরূপে চলিলে আর কিছু না হোক অন্ততঃ বুদ্ধির অনুশীলনটাও হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে অনেক নূতন নূতন বিষয়ও আবিষ্কৃত হইয়া যাইতে পারে। শুধু, দেখিবার, শুনিবার এবং বুঝিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা চাই। বন্ধুগণ মনে রাখিও, "তোমারি চরণতলে রহিয়াছে চাহি, দৈন্যনাশী ধরণীর সমগ্র রতন।"

পর্য্যবেক্ষণের মহিমা একবার শুনুন। এইরূপ আলোচনায় আমাদের যথেষ্ট লাভই হইবে। এই সকল ঘটনা নিত্য স্মরণ করিয়া আমি যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি।

সেতু-নির্ম্মাতা লোক-প্রসিদ্ধ ক্যাপ্‌টেন স্যামুয়েল ব্রাউনের নাম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তিনি টুইড্ নদীর ধারে বাস করিতেন। এক সময়ে উক্ত নদীর উপর একটী সেতু তৈরীর ইচ্ছা তাঁহার হয়। তিনি পুলের ভাবনায় ধীরে ধীরে তন্ময় হইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে এক সুন্দর প্রভাতে পুল নির্ম্মাণের কৌশল চিন্তা করিতে করিতে বাগানে বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ভ্রমণ পথে এক মাকড়সার জাল দেখিতে পাইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ জাল তৈরীর নিপুণতা পরীক্ষা করিতে লাগিয়া

গেলেন। খুঁটিনাটি পরীক্ষার পর তিনি জাল তৈরীর কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তারপর এই প্রণালী অনুসরণ করিয়াই তিনি পরবর্ত্তীকালে ঝুলানো পুল তৈরী করিয়াছিলেন। কত লোকের চল্‌তি পথে এই রকম কত বস্তুই না উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে! ক্যাপ্‌টেন স্যামুয়েল ব্রাউনও যদি তাহাদের মতো হইতেন, তাহা হইলে লোকহিতায় এই বস্তুটীর আবিষ্কর্ত্তা হইতে পারিতেন না। জ্ঞানপিপাসু চিকিৎসকেরা যেরূপ জীবদেহ ফাড়িয়া চিরিয়া দেহের প্রত্যেক অংশটীর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন, আমাদের ভিতরেও যদি ঐরূপ জ্ঞান-পিপাসা বাড়িয়া চলে তাহা হইলে আমরাও একদিন লোকহিতায় অনেক কিছু কাজ করিয়া যাইতে পারিব।

রেঁদা করা যে শক্ত কাজ মিস্ত্রী মহাশয় তাহা বারবার আমাকে বলিতে লাগিলেন। আমি কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহিলাম না। কাজের ভিতর দিয়াই আমি আমার যোগ্যতা দেখাইতে চাহিলাম। কিছুকাল পর আমার কাজ দেখিয়া মিস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "তোমার কাজ খুব সুন্দর হইয়াছে। ইহার চেয়ে ভালো কাজ আমিও করিতে পারিতাম না।"

মা প্রায়ই বলিতেন, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" মিস্ত্রী মহাশয়ও একবার এই কথাটা বলিয়া, আমাকে এক স্তূপ তক্তা দেখাইয়া বলিলেন, ইচ্ছা করিলে তুমি

এগুলিও রেঁদা করিতে পার। একদমে ঘণ্টা দেড়েক রেঁদা করিলাম। আপনারা মনে করিবেন না যে, রেঁদা করাই আমার একমাত্র কাজ ছিল। বাড়ীর তরফ হইতে পাইয়াছিলাম যোগানদারের কাজের ভার—যাহার যখন যে জিনিষের দরকার হইত আমাকে তৎক্ষণাৎ তাহাই যোগাইতে হইত—আর রেঁদা করিতাম আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তাড়নায়।

রেঁদা শেষ হইয়া গেলে মিস্ত্রি বলিলেন, "এখন তুমি পেরেক ঠুকিতে শেখো, ইহাতে ক্লান্ত হইতে হইবে না। একাজটা দেখিতে খুবই সহজ, কিন্তু একটু শক্তও বটে।" পেরেক ঠুকিতে গিয়া আমি প্রথমবারে বিফল হইলাম। মিস্ত্রী মহাশয় এই কাজের সঙ্গে তুলনা করিয়া পূর্ব্বের কাজের অনেক প্রশংসা করিলেন। আমি নিন্দা-প্রশংসায় কান না দিয়া কাজ হাসিলের ফন্দিটা চিন্তা করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, সব কাজেরই একটা কৌশল আছে, সেটা আয়ত্ত হইলেই কাজ আর আটকায় না। আমি, পেরেকের মাথাটা জুড়িয়া, ঘা দিতেই পেরেক ঠিক ভাবে বসিয়া গেল। আমি আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলাম, এই দেখুন কৌশলটা। পেরেকগুলি ঘা খাইয়া দাবিয়া যাইবার জন্যই তৈরী হইয়াছে। অতঃপর আর একটী আঘাতও ব্যর্থ হয় নাই। দ্বিতীয় বারে, সফলতার কারণ

অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম, সকল কাজেই স্থিরচিত্ত হওয়া নিতান্ত দরকার। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং চিত্তস্থৈর্য্যের অভাবেই আমি প্রথমবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। পরবর্ত্তীকালে জীবনের সকল অবস্থাতেই আমি চিত্ত স্থির রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই চিত্তস্থৈর্য্য এবং দৃঢ়তা চরিত্রবলের মেরুদণ্ড ও প্রাণবায়ু।

আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, পেরেক ঠুকিতে অকৃতকার্য্য হইয়া আমার যথেষ্ট লাভই হইয়াছিল। কাজেই, একবার কি দুইবার বিফল হইলেই কাহারো পক্ষে কোনো ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়া উচিত নহে। ইহাতে কর্ম্ম জগতে ও নৈতিক জগতে সময় এবং চরিত্রের দিক হইতে কেবল ক্ষতির অঙ্কটাই দেখা যায়। হটিয়া যাওয়াটা কোনোকালেই শিক্ষা করা কি শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। কোনো কাজে বারবার ব্যর্থ হইলেও উহাতে একান্তভাবে লাগিয়া থাকার অনেকখানি দাম আছে। অটুট চরিত্রবল না থাকিলে বারবার ব্যর্থতার আঘাত সহ্য করা বড়ই কষ্টকর। হটিয়া যাওয়ার ফলে শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতিই হয় না, ইহাতে জাতীয় চরিত্রেরও চরম অধোগতি হইয়া থাকে। ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কর্ম্মী যাহা লাভ করে, তাহার দ্বারা মানবমাত্রেই সকল দিক দিয়া অল্পবিস্তর লাভবান হইয়া থাকে।

গার্ফীল্ড

সকলের শক্তির বিকাশ আবার এক ভাবে হয় না। অনেকের সুপ্ত কার্য্যকুশলতা এবং কর্ম্মের শক্তি ব্যর্থতা-রূপ হাতুড়ির আঘাতেও চেতনা লাভ করে, এবং তখনই তাহারা জয়ীরূপে দেখা দেয়। এই রকমের একটা গল্প শুনুন। বিখ্যাত আইরিশ বক্তা কুরান্ তাঁহার যৌবনকালে এক আলোচনা সভায় বক্তৃতা দিতে যাইয়া প্রথম দিনেই যথেষ্ট লজ্জিত এবং অবমানিত হন। কুরান্ ছিলেন তোৎলা। কাজেই, যেই দাঁড়াইয়া বলিতে গেলেন, অমনি তাঁহার অভূতপূর্ব্ব অস্পষ্ট কথাগুলি ঘরের ভিতর একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। তিনি নিজেও ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তির বাঁচিবার মতো তিনি অনেক চেষ্টাই করিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে দুই একটী শব্দ বাহির হইল, তার একবর্ণও কেহ বুঝিতে পারিল না। এই ভাবে কিছুকাল প্রাণপণ চেষ্টার পর নিজের কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়া কুরান্ নিতান্ত অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। সঙ্গী-বন্ধুরা হাসির চোটে ঘর ফাটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। তাহাদের ভিতর একজন আবার, হাসিটাকে আরো জমাইয়া তুলিবার জন্য আস্তে অথচ সকলে শুনিতে পায় এমন ভাবে বলিল, "ওহে বোবা বক্তা!" বক্তার উদ্দেশ্য সফল হইল। এই কথায় ঘরময় আবার তুমুল হাসির রোল উঠিল। এই ঠাট্টা কুরানের

মর্শ্মে বিষম ঘা দিল। সভাস্থল হইতে করতালির পরিবর্ত্তে অপরিসীম শ্লেষ, ব্যথা এবং যাতনা বহিয়া চলিয়া যাইবার সময়, যুবক কুরানের অন্তরাত্মা সমুদয় শক্তিতে গর্জ্জিয়া বলিয়া গেল, "আজ তোমরা হাসিতে পার, কিন্তু মনে রাখিও, একদিন আমার এই তোৎলা জিহ্বা সায়েস্তা হইবেই, আর সেদিন এই তোমরাই আবার আগ্রহের সহিত আমার বক্তৃতা শুনিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিবে।" কুরানের বাক্য সত্য হইয়াছিল।

ঘর তৈরীর কালে দিনরাত মিস্ত্রীর পাঠশালায় হাতে-কলমে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়া, হাতের জড়তা দোষ দূর করিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং এই ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের দিকটাও বেশ ভালো ভাবেই তখন খতাইয়া দেখিয়াছিলাম। ঘর তৈরী হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম এই ব্যবসাটা বেশ লাভজনক। ভোরে শয্যাত্যাগের পর হইতে রাত্রিতে নিদ্রালাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কালটার ভিতর একমাত্র এই চিন্তাটাই অন্য সকল চিন্তার চেয়ে আমার মনের সাম্‌নে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। আমি আমার মনের কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিলাম না। এমন কি মা'র কাছেও নয়।

নূতন ঘরে আসিবার দিন কতক পরেই দাদা মিশিগানে চলিয়া গেলেন। আমি চাষের কাজে লাগিলাম। কিন্তু ছুতার মিস্ত্রীর ব্যবসায়ের কথাটা আমার বরাবর মনে ছিল।

একদিন সময় ও সুযোগ বুঝিয়া মা'র কাছে কথাটা পাড়িয়া ফেলিলাম। আমার অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা জানিয়া মা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। নিজের জমিতে এবং অপরের কাজে দুই জায়গায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে পাছে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এজন্য মা ভাবিত হইলেন। আমি নানা রকম যুক্তি দিয়া মা'র সম্মতি লইয়া একদিন ট্রাট্ মহাশয়ের বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। মিঃ ট্রাট্ আমার মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। কুশল-প্রশ্নাদির পর আমার আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে আমার কাজের ইচ্ছা জানাইলাম। আমার অন্যগুণ কিছু ছিল কিনা জানিনা, তবে বসিয়া বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার দোষটুকু আমার মোটেই ছিল না। সেই জন্যই মিস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "তোমার শরীরের হাড়গুলি দেখ্ছি মোটেই কুঁড়ে নয়।" আমার অর্থোপার্জ্জন যে মা'র জন্যই ইহা শুনিয়া বলিলেন, "মাতৃভক্ত ছেলেরা জীবনে কখনো দুঃখ পায়না, কোনো কাজে তারা বিফলও হয় না। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে কাজ দিব।"

এক স্তূপ তক্তা রেঁদা করার কাজ পাইলাম। প্রতি তক্তা দুই পয়সা হিসাবে ধার্য্য হইল। আমি পরদিনই কাজে লাগিবার ইচ্ছা জানাইলাম। ট্রাট্ মহাশয় অবশ্য আমাকে যথেষ্ট সময় দিয়াছিলেন। কাজ শেষ হইলেই দাম দিবেন বলিয়া দিলেন।

বাড়ী পৌঁছিয়া মাকে এই শুভ সংবাদটা দিলাম। মা খুব খুসি হইলেন। কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন কাজ জুটানো খুব শক্ত হইবে। মা বলিলেন, দিনে দুই ঘণ্টা বড় জোর তিন ঘণ্টা কাজ করিতে। আমি বলিলাম, "আমি ছয় ঘণ্টা কাজ করিব। যদি আগামী কল্য আমাকে দুই তিন ঘণ্টার ভিতর আসিতে দেখ তবে জানিও, হয় আমার একখানা হাত খোয়াইয়াছি আর নয়ত কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়াছি।" মা অনেক সদুপদেশ দিলেন। আমি সে সব শুনিয়াও শুনিলাম না। সকল বৃদ্ধই মনে করেন, যুবক-চরিত্রের এটা একটা মস্ত দোষ, কিন্তু আমার মনে হয়, এই অদম্য ভাবটাই যুবক-চরিত্রের আসল সম্পদ।

পরদিন খুব ভোরে কর্ম্মস্থলে পৌঁছিলাম। মিঃ ট্রীট বলিলেন, "জেম্‌স্‌, যে পাখী খুব ভোরে বাসা ছাড়ে, তার কখনো আহারের অভাব হয় না।" সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমার কাজ শেষ হইয়া গেল।

মিস্ত্রী মহাশয়কে বলিলাম, একশত তক্তা রেঁদা হইয়াছে। তিনি প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তারপর আমাকে অধিক শ্রমের কুফল বুঝাইয়া দিলেন। একে মান্য ব্যক্তি তার উপর আবার হিতাকাঙ্ক্ষী, কাজেই তাঁহার সকল কথা দুই কান দিয়া শুনিয়া গেলাম। কিছুই বলার দরকার আমার ছিল না,—কারণ, কাজ শেষ করা আমার উদ্দেশ্য।—আমার সে

উদ্দেশ্য সফল হইয়া গিয়াছিল। আমি নগদ তিন টাকা দুই আনার পয়সা লইয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

মা আমার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়া মা'র কোচড়ে পয়সাগুলি ফেলিয়া দিলাম। তখন মনে যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলা সম্ভব নয়। আমি মাকে দিয়াছিলাম, এই জগতের পরম বস্তু তামার পয়সা, আর তার পরিবর্ত্তে মা আমাকে দিয়াছিলেন—প্রাণপণে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া—একমাত্র তাঁহারই দৌলত, কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

৮

এখন আমি সঙ্গে না থাকিলে ট্রীট্ মহাশয়ের আর চলে না। একে আমার হাত পাকিয়া গিয়াছিল তার উপর আবার কাজ কর্ম্মটাও বুঝিতাম। কাজেই মিঃ ট্রীট আমার উপর যথেষ্ট ভরসা করিতেন। ছুতার মিস্ত্রির কাজ করিবার পর যেটুকু সময় জুটিত সেই সময়টাতে পড়াশুনা করিতাম। এইরূপে পড়া-শুনার ফলে পাটীগণিতে আমি যথেষ্ট অগ্রসর হইয়া পড়িলাম। দুঃসাহসিক কার্য্যাবলী সম্বন্ধীয় বইগুলিই তখন আমার বেশি প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হোক, আবার ট্রীট্ মহাশয়ের ডাক আসিতেই পড়া-শুনা বন্ধ করিয়া তাঁহার সঙ্গে ক্লীভল্যাণ্ডের নিকটে একটা গোলা তৈরী করিতে রওনা হইলাম। গোলা আমি ইতিপূর্ব্বে আরোও তৈরী করিয়াছিলাম। এবারে ক্লীভল্যাণ্ডের সব চেয়ে বড় ক্ষার-ব্যবসায়ীর জন্য গোলা তৈরীর কাজে হাত দিলাম।

দিন কতক কাজ করিবার পর মিঃ ট্রীটের নিকট জানিলাম, ব্যবসার মালিক বারটোন মহাশয় আমার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। অশিক্ষিত, রূঢ়প্রকৃতি এই ক্ষার-ব্যবসায়ী

নিজেই বলিয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত প্রশংসা করার মতো পাত্র নাকি তাঁহার চোখেই পড়ে নাই! আমার ভদ্র ব্যবহার, কাজের কৌশল এবং মুখমণ্ডলে পবিত্রতার একটা আভা দেখিয়াই নাকি তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই জন্যই গোলার কাজ শেষ হওয়ার সম-সম কালে, তিনি আমাকে তাঁহার ব্যবসায়ে যে কোনো উপায়ে নিয়োগ করিবার জন্য নানা রকম ফন্দি আঁটিতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত নিজেই একদিন আমাকে বলিয়া ফেলিলেন, "কেমন, তুমি এখানে এসে কাজে লাগ্‌বে তো?" আমার বয়স তখন বৎসর পোনেরো। এই রকম একটা প্রস্তাব আমার নিকট একদম নূতন। আমি মা'র নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই বলিতে পারি না, জবাব দিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম—

—"কতদিন আপনার আমাকে দরকার হবে?"

—"যতদিন তোমার ইচ্ছা। তুমি আজীবন এখানে থাকিতে পার।"

—"বেতন কত দিবেন?"

—"মাসে ৪২৲ টাকা, আর অতিরিক্ত ৬৲ টাকা—একুণে ৪৮৲ টাকা।" বেতনের বহর দেখিয়া আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ কতটা তাহাও বুঝিয়া ফেলিলাম। সত্য সত্যই বৃদ্ধ আমাকে কাজের লোক ঠাওরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। আমি

তাঁহাকে বলিলাম, বাড়ী যাইয়া মা'র সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যত শীঘ্র হয় খবর দিব। কাজ শেষ হওয়ার দুই দিন পূর্ব্বে বৃদ্ধ আবার উতলা হইলেন—"তুমি যে আস্‌বে তা আমি কি ক'রে জান্‌বো?"—"মা'র যদি মত হয়, তাহা হইলে আগামী সোমবার আপনি আমাকে এখানেই পাইবেন, আর যদি মা'র মত না পাই তাহা হইলে আর আমি আসিব না।"

দুই দিন পর কাজ শেষ হইয়া গেল। আমাদের আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল বারটোন-পরিবারে। কাজেই, তাঁহার টাকা চুকাইয়া দিলাম। বৃদ্ধের এতখানি অনুরোধ-উপরোধের সঙ্গে আর একটা বস্তুও আমার মনের সাম্‌নে উঁকি মারিতেছিল—সেটা মাসিক ৪২৲ টাকার অঙ্কটা। মনে মনে ভাবিলাম, বৃদ্ধ অতিরিক্ত ৬৲ টাকা দেয় ভালো তাঁর অনুগ্রহ, না দিলেও আমার ক্ষতি নাই, বৎসরে ৫০৪৲ টাকা তো আমি পাইবই। তার উপর আবার যতকাল ইচ্ছা কাজ করিতে পারিব। এই চিন্তা সাগরের তরঙ্গের চেয়েও ভীষণ ভাবে সকল সময়ে আমার চিত্তকে তোলপাড় করিতে লাগিল। আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন, ইহা আমার কাছে একদম অপ্রত্যাশিত। একে আমি তখনো ছেলেমানুষ, তার উপর আবার ধনের আশায় গরীবের চিত্তের যে অবস্থা হয়, ইহা তো তাহারই নমুনা!

বাড়ী পৌঁছিয়া মাকে বারটোন মহাশয়ের সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। ক্ষার-ব্যবসায়ের কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "এটা তোমার পক্ষে সুবিধার নয় বাপু!"

মা'র কথায় আমার একটু রাগই হইল। বলিলাম, টাকার দিকটায় তো সুবিধা আছে! আর এ পথটা খারাপ হইল কিসে?

মা বলিলেন, "অজ্ঞ, কুশিক্ষিত এবং দুশ্চরিত্র লোকেরাই সাধারণতঃ এসব ব্যবসায়ে কাজ করে।" ইহাদের সঙ্গে থাকিলে ইহাদের চরিত্রের প্রভাব তুমি এড়াইতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, যে কোনো জায়গায় যাইব কুসংসর্গের সামনে আমাকে সেইখানেই পড়িতে হইবে। আমি যাইব কাজের জন্য, কুসঙ্গীদের সঙ্গে আমার তো কোনো প্রয়োজন নাই!

"সে কথা ঠিক, কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা তোমারই বেশি।"

—যদি তাই হয় মা, তাহা হইলে তখন বুঝিব প্রলোভনের তুলনায় আমি খুবই দুর্ব্বল।

মা'র সেদিনের একটা কথা আজও আমার মনে পড়ে। তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে নিজে যত বড় ভাবি, সত্য সত্যই, ঠিক তত বড় আমরা নই—মানুষ

বড়ই দুর্ব্বল। যে দাঁড়াইয়া আছে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা তারই বেশি, ইহা তাহার মনে রাখা উচিত।"

মা পাছে অন্তরে ব্যথা পান এই ভয়ে আমি কোনো-দিনই তাঁহার অবাধ্য হই নাই। একদিকে অতগুলি টাকার ভাবনা, অপর দিকে বারটোন মহাশয়কে যে কথা বলিয়া আসিয়াছিলাম তার জন্য উদ্বেগ, তার উপর মা'র নিষেধ, চিন্তার এই ত্রিবেণীসঙ্গমে পড়িয়া আমার মনটা অনবরত হাবুডুবু খাইতে লাগিল। অগত্যা বলিলাম, "মা, তাহা হইলে তুমি আমাকে যাইতে বারণ করিতেছ ?"

মা আমাদিগকে আদর করিতেন বটে কিন্তু সকল সময়ে সকল আব্‌দার পছন্দ করিতেন না। না ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনো কথারই জবাব দিতেন না। অনেক চিন্তার পর মা অনুমতি দিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয়, সংসারের সঙ্গে একদিন তোমার পরিচয় হইবেই এবং এখানেই তার সূত্রপাত।"

মাকে বলিলাম, মা তুমি প্রায়ই বলিয়া থাক ভগবান আমার পথ করিয়া দিবেন। তোমার ভগবান যদি আমার পথ করিয়া না দেন তবুও কি চিরদিন তাঁহার মুখ তাকাইয়াই আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে! আমার নিজের কি কিছু করা উচিত নয় ?"

মা বলিলেন, "যদি সকল প্রলোভন এড়াইয়া, নিজের

চরিত্র ঠিক রাখিয়া বারটোন মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিতে পার, তাহা হইলে একদিন বুঝিতে পারিবে, আমার ভগবান তোমার পথ করিয়া দিলেন কি না!”

নির্দ্দিষ্ট সোমবার খুব ভোরে মা'র আশীর্ব্বাদ লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার পোষাক-পরিচ্ছদ তেমন কিছুই ছিল না। সামান্য কিছু দরকারী জিনিষ যাহা ছিল তাহা একখানি রুমালে বাঁধিয়া লইলাম। বারটোন মহাশয় আমাকে দেখিয়া যারপরনাই খুসি হইলেন। বারটোনের স্বার্থ আমি, আর আমার স্বার্থ বারটোনের টাকা। বিভিন্ন স্বার্থের বিভিন্ন ব্যবসাদার বলিয়াই সংসারের মানুষ যার-যার পথে অবাধে চলিয়া যায়! যেখানে এক স্বার্থের বহু ব্যবসাদার যত বিপদ সেইখানেই। যাহা হোক বারটোন মহাশয় আমার থাকার জায়গা দেখাইয়া দিয়া আমাকে কারখানায় লইয়া চলিলেন।

কারখানায় ঢুকিয়া দেখিলাম সমস্তটা ঘর যেন একটা অলক্ষ্মীর আস্তানা। লক্ষ্মীশ্রী কোথাও একটু নাই। ব্যবসাটাই নোংরা, তথাপি এমন নোংরামি আমার চোখে আর কুত্রাপি পড়ে নাই। চোখে আর সহিল না। আমি শভেল লইয়া ছাইয়ের গাদা সাজাইতে লাগিয়া গেলাম। আমি কখনো সেখানে বয়লারের তত্ত্বাবধান করিতাম, আবার কখনো ক্ষারের খরিদ্দারদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা চালাইতাম।

এগুলি আমার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল না, তথাপি সময়োচিত কর্ত্তব্যজ্ঞানেই আমি এসব কাজ করিতাম। আমার বিবেচনায়, ঝুড়ি-ঝুড়ি খোসামুদি ঢালিয়া কর্ম্মকর্ত্তার মন ভিজাইবার চেষ্টা না করিয়া, আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়া কিছু কিছু অতিরিক্ত কাজ করা বরং ঢের ভালো। কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মটাই তার বড় রকমের খোসামুদি। এই সংসার একটা বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে একটা বড় রকমের যুদ্ধক্ষেত্রও বলিতে পারি। এখানে যে চট্‌পটে, যে হুঁশিয়ার, যে কর্ম্মঠ, যে কৌশলী তার জয়লাভ অনিবার্য্য।

আমার মনিবের ব্যবসাকে আমার নিজের ব্যবসা বলিয়াই আমি মনে করিতাম। কারণ, যদি এরকম ধারণা মনে না আসে তাহা হইলে প্রত্যেক কাজেই একটা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব থাকিয়া যায়। আমি মনিব ও চাকরের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকাটা মোটেই পছন্দ করি না। মনিব ও চাকর একটা কথার কথা মাত্র, শুধু একটা পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজের বেলায় উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন আছে, এবং আর্থিক দিক হইতে চাকরের যখন চাকুরী করিয়াই অন্ন-সংস্থান করিতে হয় তখন মনিবের মঙ্গলচিন্তা করা তাহার উচিত। মনিবের উন্নতির উপরই তাহার উন্নতি নির্ভর করে। ফাঁকি দিয়া পয়সা রোজগারটা রোজগারই

নয়। আবার মনিবের উন্নতিও নির্ভর করে তাহার চাকর অথবা কর্ম্মচারীদের প্রতি সর্ব্বপ্রকার সুবিবেচনার উপর। মনিব অধিক পরিমাণে স্বার্থপর হইলেই তাহার পক্ষে পদে-পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। মনুষ্যত্বের দিক দিয়াও মনিবের একটা দায়িত্ব আছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপর মনিব যে কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে উহা তাহার গোরস্থান ছাড়া আর কিছুই নহে।

কারখানার কোনো কর্ম্মী উপস্থিত না থাকিলে আমি নিজেই কাজ শেষ করিয়া ফেলিতাম। প্রভাতে সকলের আগে সেখানে হাজির হইতাম এবং রজনীতে সকলের শেষে কারখানা পরিত্যাগ করিতাম। পিতা পুত্রের উপর যে বিশ্বাস রাখেন, বারটোন মহাশয়ের আমার উপর তার একরত্তিও কম ছিল না। তাঁহার সেই অটল বিশ্বাস আমার নিকট মাসিক ৪২৲ টাকার অনেক বড় ছিল, এবং এই বিশ্বাসই আমার ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতির পক্ষে একটা বড় রকমের মূলধন হইয়াছিল। আমি টাকার জন্যই চাকরী করিতে গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু টাকাটাকেই পরম পদার্থ মনে করিতে পারি নাই। বিশ্বাস, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতিকে উপযুক্ত সম্মান দিবার মতো শক্তির আমার কোনোদিনই অভাব হয় নাই।

কারখানার প্রতি আমার দরদ দেখিয়া, বাহিরের যাহারা

খবর রাখিত না তাহাদের অনেকেই, আমাকে বারটোনের পুত্র ঠাওরাইয়া লইয়াছিল। আমার মনে সেইদিন যথেষ্ট আনন্দ হইলেও, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়াছিলাম যে, মানুষ যখন পরের জন্য খাটে তখন বোধ হয় পর-পর ভাবটা দূর করিয়া দিয়া কাজ করে না। দীর্ঘকাল যাবৎ মনিব-চাকরের ভিতর স্বার্থের দরুণ যে অসন্তোষ সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে ইহাই ঐ গা-বাঁচাইয়া কাজ করার একমাত্র কারণ—যেন তেন প্রকারেণ মনিবকে শোষণ করাই ইহাদের লক্ষ্য।

একদিন একব্যক্তি আমাদের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য একগাড়ী ছাই লইয়া আসিল। গৃহস্থরা জমি পরিষ্কার করিবার সময় গাছের যে সকল গুঁড়ি সংগ্রহ করিত, সেগুলি পোড়াইয়া তাহারা ছাই করিত। পরে ক্ষার-ব্যবসায়ীদের নিকট সেই সব ছাই বিক্রয়ের দ্বারা দু'পয়সা রোজগার হইত। লোকটী বলিল, গাড়ীতে পাঁচ মণ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের ছাই আছে। আমি খরিদ করিবার উদ্দেশ্যেই ছাইগুলি গাড়ী হইতে নামাইয়া মাপিয়া দেখিলাম, ছাই প্রায় সাড়ে আটাশ সের কম। বারটোন মহাশয়ের অন্য শত দোষই থাকুক না কেন, এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উদারতার পরিচয়ই পাইয়াছিলাম। তিনি এ পর্য্যন্ত ছাই-বিক্রেতাদের কথার উপরই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। লোকটী পাঁচ মণ

সাড়ে সাঁইত্রিশ সেরের মাত্রা ধরিয়াই তর্ক করিতেছিল। আমার ভুল প্রমাণ করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, পাঁচ মণ নয় সেরের দামের চেয়ে আর এক দাম্‌ড়িও বেশি দিব না। আমি নিজে মাপিয়া দেখিয়াছি, আবার তোমাকে মাপিয়া দেখাইতে পারি, ছাই পাঁচ মণ নয় সেরের বেশি নাই। আমাদের তিন জনের কথা তোমার একলার কথার চেয়ে বেশি অকাট্য। শেষ পর্য্যন্ত লোকটা, পাঁচ মণ নয় সেরের দাম লইয়াই বিদায় হইল। ঠিক সেই সময়ে বারটোন মহাশয় কারখানায় আসিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, এই সকল লোকেরা আপনার সরল বিশ্বাসের সুযোগে এপর্য্যন্ত আপনাকে যথেষ্ট ঠকাইয়া আসিয়াছে। আমি আশ্চর্য্য হইলাম—বারটোন মহাশয় তখনও নীরব !

কিছুদিন কারখানায় থাকিয়াই বুঝিলাম, লোকগুলি বদমায়েসের জাসু। যাহা হোক, আমি উহাদের সঙ্গে কেবল ব্যবসা সম্পর্কে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই আলাপ করিতাম। উহারা যখন তখন অভদ্রোচিত শব্দ উচ্চারণ করিত এবং কথায়-কথায় শপথ করিয়া বসিত। দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতাম, ইহারা মানুষ হইবে কবে !

সেখানে অনেক বই পাইয়াছিলাম। "নাবিক সিন্ধবাদ", "জলদস্যুদের কাহিনী", "বিখ্যাত চোর-ডাকাতদের জীবনী"

ইত্যাদিই ছিল তখনকার দিনের সাহিত্য। লোকের রুচি মাফিক এই ধরণের বই লেখা হইত। কাজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে এই সকল বই পড়িয়া সময় কাটাইতাম। বইগুলি মন্দ লাগিত না। বারটোন মহাশয়ের প্রিয় কর্ম্মচারী যে একজন পড়ুয়া লোক, একথা লোকের কাছে বলিতে তিনি কোনো সময়েই কার্পণ্য করেন নাই। এই বইগুলি খরিদ করিয়াছিলেন বারটোন মহাশয়ের কন্যা। তাঁহার এই যুবতী কন্যাটি ছিলেন শহরের ফুলবিবি। তিনি কিছু-কিছু লেখা-পড়া জানিতেন এবং শহুরে আদব-কায়দায়ও দুরস্ত ছিলেন। ক্লীভল্যাণ্ডে একখানা কাগজ বাহির হইত। তিনি সময়ে সময়ে ঐ কাগজের জন্য কবিতাও লিখিতেন। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও, তাহার চরিত্রের একটা কুকীর্ত্তির ফলেই নাকি তিনি সাধারণের নিকট খুব তাড়াতাড়ি পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এরূপই শুনিয়াছিলাম।

আমার মনিব-পরিবারের সকলে যখন শুইতে যাইতেন, আমি আলো ও বই লইয়া তখন আমার শয়ন ঘরে গিয়া পড়িতে বসিতাম। অনেক শীতের রাত্রিতেও বারোটা পর্য্যন্ত বই পড়িতে পড়িতে আমি তন্ময় হইয়া যাইতাম।

ঐ সকল পুস্তকের রচনা-ভঙ্গীর ফলে আমার শরীর এত উত্তেজিত হইয়া উঠিত যে, আমি কোনোদিন শীতের

কাছে মাথা নত করি নাই। এই সকল পুস্তক পড়িয়া আমার পৃথিবী ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। আমার যুবকচিত্ত এই ভাবনাতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এক রাত্রিতে ভাবিতে ভাবিতে এই চাকুরীই যে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয় তাহা যেন স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলাম। নাবিক হইয়া পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইব, বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধিশালী নগর-নগরী দেখিব এই সকল ভাবনাই দিবারাত্র ভাবিতাম। সেই ভাবনার ফলে এক রাত্রিতে আমি এক পলকও ঘুমাইতে পারিলাম না। হঠাৎ মা'র কথা মনে পড়িয়া গেল। এ সম্বন্ধে মা'র মত পাইব কি না, সকল ভাবনার উপর তখন ইহাই হইল আমার বড় ভাবনা। কারণ, যদি কেহ আমার এই প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়, আর কাহারো প্রতিবন্ধকতা কার্য্যকরী হয় তবে সে মা এবং ম'ার ইচ্ছা। দেশকালনির্ব্বিশেষে মাতৃহৃদয় সর্ব্বদাই সন্তানের জন্য ভাবিত থাকে। তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রসন্তানদিগকে ঘরের কোণে আটক করিয়া রাখিতেই ভালোবাসেন। সন্তানকে মানুষ করিবার জন্য, সংসারের ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিবার মতো প্রাণের বল, এবং সকল প্রকার বাধা-বিপত্তির উপর জয়ী হইবার মতো শিক্ষাদানের শক্তি, তাঁহাদের নাই। যাহা হোক, মা বাধা দিবেন নিশ্চয়,

আর আমিও যে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িব ইহাও কথার কথা নয়! অবশেষে নিদ্রা আসিল, আমাকে সান্ত্বনা দিতে নহে—আরো পাগল করিয়া তুলিতে। স্বপ্নে নয়ন-মনোলোভা অনেক নগর-নগরী দেখিলাম। তাহা একমাত্র স্বপ্নে দেখিবারই বস্তু!

বারটোন মহাশয় আমার কাজকর্ম্ম দেখিয়া আমাকে খুবই ভালোবাসিতেন। একদিন তিনি নিজে আমাকে ডাকিয়া আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে অনেক আশা ভরসা দিলেন। আমি ঠিক সেই সময়েই তাঁহাকে আমার নাবিক হইবার বাসনা জানাইলাম। এই কথায় তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন তাঁহার মাথায় বজ্রপাত হইল। বারটোন মহাশয় যে স্নেহের দাবীতেই আমার এই প্রস্তাবে বাধা দিতেন ইহা নিশ্চিত, কিন্তু বাধাটার বেশির ভাগই আসিত তাঁহার স্বার্থের দিক হইতে। তিনি সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে আমার মনের সামনে ঠিক ঐ রকম একটা কারখানার ছবি আঁকিয়া দিতেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ খুলিয়া নানা রকমের প্রশংসা করাও সুরু করিলেন, কিন্তু আমি স্থির—ধীর—অটল।

এই সময়ে এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে আমার স্থান পরিত্যাগের সংকল্পটা একেবারে পাকা হইয়া গেল। বারটোন মহাশয়ের কন্যাটির এক প্রণয়ী ছিল। এক

রাত্রিতে যখন সে বারটোন মহাশয়ের বাড়ীতে হাজির হয়, আমি তখন অগ্নিকুণ্ডের পাশে পাটীগণিতের একটা শক্ত অঙ্ক লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। যে ঘরে আমি শয়ন করিতাম, সেই ঘরটা ছিল খুব বড়। যুবক-যুবতী সেই ঘরের এক নিভৃতকোণে নিজেদের গল্পগুজবে মাতিয়া গেল। কিছুকাল পরে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অগ্নিকুণ্ড পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হইয়া আমিও খাতাপত্র লইয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমার তখন বয়স হইয়াছিল এবং এসব ক্ষেত্রে কি করা উচিত সে জ্ঞানও আমার জন্মিয়াছিল। কাজেই, সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিলাম। কোনোদিকে না-তাকাইয়া চোখ-কান বুজিয়া গণিতে মন দিলাম। কিছুক্ষণ পর গণিতের চিন্তা ছাড়া আর কোনো বিষয় আমার মনেই ছিল না। বোধ হয়, তাহারা নিজেদের অসুবিধার জন্য অথবা অন্য কোনো মতলবে ঘর ছাড়িয়া যখন বাহির হইয়া চলিয়া যায়, তখন বারটোন মহাশয়ের কন্যাটি আমাকে বলিয়া গেল, "মাহিয়ানার চাকর-বাকরদের এখন ঘুমানো উচিত।" হঠাৎ এই কথাটা শুনিয়াই আমি চোখ তুলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলাম মাত্র,—তাহার কথার কোনো জবাব দিলাম না।

কথাটা প্রাণে বড়ই লাগিয়াছিল, তাই আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুম আসিল না। বারটোন মহাশয়ের

কন্যাটি চলিয়া যাইবার সময় আমার দুই চোখ হইতে ঘুম যেন জন্মের মতো তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। বারবার ঐ এক কথা মনে পড়িতে লাগিল। ঠিক করিলাম, আর না! এখানে আর চাকুরী করা হইবে না। "চাকর!"—আমার ভিতরে কে যেন বলিল, "তুমি চেষ্টা করিলে অনেক বড় হইতে পার।" হয়ত ইহা আমার তখনকার মানসিক উত্তেজনার ফল, কিন্তু আমিও জবাব দিলাম, "তাহাই হইবে, আমি বড় হইব। আর একদিনও এখানে থাকা হইবে না।" পরদিন ভোরেই এই বাড়ী ত্যাগ করা ঠিক করিলাম। এই বেশ্যা সত্য সত্যই একদিন দেখিবে, আমি মাহিয়ানার চাকর নই—আর কিছু।

শুনিয়াছি প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত নিউটনকে তাঁহার জনৈক সমপাঠী পেটে লাথিমারার ফলেই নাকি আমরা তাঁহাকে এইরূপে পাইয়াছিলাম। আমারও জীবনে যদি কোনো উন্নতি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার জন্য ঐ মেয়েটাও কতক দাবী করিতে পারে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া আমার যা কিছু তৈজসপত্র ছিল একেবারে সঙ্গে লইয়া, বারটোন মহাশয়ের সাম্‌নে হাজির হইয়া বলিলাম, আমি এখনই বাড়ী যাইতেছি। আমার এই রকম মানসিক দুরবস্থাতেও বারটোন মহাশয়ের অবস্থা আমাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। বারটোন

মহাশয় বলিলেন, "সত্যি!"—"আজ্ঞে হাঁ। এই ব্যবসা এই জন্মের মতো শেষ।" আমি তাঁহাকে তাঁহার কন্যাটীর আমার প্রতি দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই বলিলাম না। কারণ আমি মোটেই প্রতিকারপ্রার্থী ছিলাম না। তিনি তখনো আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন,—আমি শুধু শুনিয়াই গেলাম। শেষ পর্য্যন্ত আমার অটল অচল ভাব দেখিয়া আমার পাওনা চুকাইয়া দিলেন। আমি দুপুরের পূর্ব্বেই বাড়ী পোঁছিলাম।

৯

হঠাৎ আমাকে বাড়ী আসিতে দেখিয়া মা খুবই খুসি হইলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট ভাবিতও হইয়াছিলেন। মা'র হাতে ১৬৮৲ টাকা দিয়া বলিলাম, মা, এবারে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করিব —চাক্‌রী আর নয়! এতাবৎ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল মাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। মা সেই মেয়েটার এত বড় অভদ্র ব্যবহারটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। মাকে বলিলাম, যদি কামোন্মত্ত সেই মেয়েটার আমাকে অপমান করিবার ইচ্ছা না থাকিত তাহা হইলে 'মাহিয়ানার চাকর' কথাটাকে আমিও উড়াইয়া দিতে পারিতাম। মা'র নিকট হইতে জবাব পাইলাম, "ভগবান যা করেন, তা ভালোর জন্যই।"

দিন কয়েক পর একদিন নূতন কাজের প্রস্তাব করিয়া মা'র অনুমতি পাইলাম। এই ভরসায় সমুদ্র-গমনের ইচ্ছাটাও প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। মা, "বলিস্ কিরে!" বলিয়া এমন এক আওয়াজ করিলেন, যার ফলে আমি পুরাপুরি বেকুব বনিয়া গেলাম। মা'র বুকে কেহ শেল মারিলেও বোধ করি, মা ইহার চেয়ে অধিক মর্ম্মান্তিক ভাবে চীৎকার

করিতে পারিতেন না।—বলিলাম, "মা, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সমুদ্রে যাইব না।" মা ধীরে ধীরে শান্ত হইলেন। বুঝিলাম, একমাত্র সমুদ্র-গমনের প্রস্তাব ব্যতীত আমার আর সকল প্রস্তাবেই মা রাজি।

আপাততঃ বিষয়টা এইখানেই চাপা পড়িল। দিন কতক সংসারে কাজ-কর্ম্ম গুছাইতে লাগিলাম। অবশ্য তখন অন্যত্র কাজের চেষ্টায়ও ছিলাম। এমন সময়ে খবর পাইলাম, ক্লীভল্যাণ্ডের নিকট নিউবার্গে আমার এক কাকা অনেকটা জমি পরিষ্কার করিবার জন্য জনকতক কাঠুরিয়া খুঁজিতেছেন। সেখানে যাইতে মা কোনো আপত্তি করিলেন না। কারণ, একে ইহার সঙ্গে সমুদ্র-গমনের কোনো সম্পর্ক ছিলনা, তারপর ঐ স্থানের নিকটেই এক জায়গায় আমার বড়দিদির বিবাহ হইয়াছিল। মা কখনো একদিক দেখিয়াই মতামত দিতেন না। আমার বিশ্বাস এই মত দেওয়ার ভিতর তাঁহার আরো কোনো উদ্দেশ্য ছিল।

নিউবার্গে আমার কাকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার যথেষ্ট আদর-আপ্যায়নের পর আমি কাজের কথা পাড়িলাম। তিনি আমাকে কাজের পরিমাণ এবং কঠোরতা সম্বন্ধে ভালোরূপে বুঝাইলেন। আমিও অন্য কাজের চেয়ে কাঠ-কাটিতেই যে বেশি ভালোবাসি তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম। কাকা বলিলেন,—"সাম্নে

গরম কাল আসিতেছে, তুমি কি বেশি গাছ কাটিতে পারিবে? বেশি গরম বোধ করিলেই তো তুমি কাজ বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে?

আমি বলিলাম, খুব সম্ভব তাহা হইবে না। আমি দুই মাস কাজ করিতে পারিব, এই বিশ্বাস আমার আছে।

তিনি বলিলেন, "যদি একশত গাছ তোমাকে কাটিতে দেওয়া হয়, তবে তুমি রাজি আছ তো?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আছি। এক-একটা গাছের দরুণ আপনি কত দিবেন?"

কাকা বলিলেন, "একশত গাছ কাটিলে প্রতি গাছের দরুণ ১॥/০ আনা হিসাবে দিব, এবং কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার পাওনা টাকা হাতে পাইবে।—আচ্ছা, তুমি কত দিনে পারিবে মনে কর?"

—"পঞ্চাশ দিনে।"

—"যদি তুমি একাজে পাকা লোক না হও, তাহা হইলে আরো কিছু বেশি দিন দরকার হইবে মনে হয়।"

—"আমি দিনে অনায়াসে দুইটা করিয়া গাছ কাটিতে পারিব।"

কাজের কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া দিদির বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। বলা বাহুল্য, অনেক দিন পর দিদির রাশি রাশি স্নেহ পাওয়া গেল। দিদির বাড়ীতেই খাওয়া-থাকার

বন্দোবস্ত করিলাম। পরদিন ভোরে কাঠুরিয়া-বেশে আমি কর্ম্মস্থলে হাজির হইলাম।

আমার আত্মীয়-স্বজন এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদের সহিত একমত হইয়া আপনারাও হয়ত বলিবেন, এরি-হ্রদের ধারে আমার কাজের জায়গা হওয়াটা মোটেই ভালো হয় নাই। কিন্তু আমি ইহাকে আমার সৌভাগ্যের পরিচায়কই মনে করিয়াছিলাম। আমি মাঝে মাঝে গাছকাটা বন্ধ রাখিয়া একদৃষ্টে এরির বিরাট্ নীলবুকের উপর দিয়া অসংখ্য জাহাজের যাতায়াত দেখিতাম। এই দেখার আনন্দটা যে শুধু আমার নয়নেই বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা নহে। নয়নের ভিতর দিয়া মরমে যাইয়া এক মহা আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছিল। বারটোন মহাশয়ের বাড়ীতে বইয়ে যে সকল কাহিনী পড়িয়াছিলাম, এখন সেগুলি জীবন্ত দেখিবার সুযোগ পাইলাম। কল্পনা বাস্তব ইন্ধনে জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে জাহাজগুলি ঢেউ ভাঙ্গিয়া হাঁসের মতো যখন চলিয়া যাইত, তখন মনে হইত আমিও যেন উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছি। কখনো বা গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া, জাহাজগুলি গণিতে থাকিতাম। একদিন সত্য সত্যই আমিও এরির বুকে ভাসিব ভাবিয়া মনে মনে যথেষ্ট আনন্দ পাইতাম। কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিলাম।

আমরা জনকতক লোক কাঠ-কাটিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া-

ছিলাম। একজন জার্ম্মাণও আমাদের সঙ্গে ছিল। লোকটা ছিল খুবই চতুর। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজীতে কোনোরূপে মনের কথাটা সে প্রকাশ করিত, একটু চেষ্টা করিয়া আমরা তাহা বুঝিয়া লইতাম। আমার ধারণা ছিল সে একাজে তত ওস্তাদ নয় এবং ভালোরূপে লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহার কুড়ুলও তত চট্‌পট্‌ চলে না। এক সপ্তাহ পরে দেখিলাম, জার্ম্মাণ কাঠুরিয়াটী দিনে দুইটী করিয়া গাছ কাটিয়া গিয়াছে, আর তাড়াতাড়ি হাত চালাইয়াও আমি তাহার চেয়ে বেশি যাইতে পারি নাই।

জার্ম্মাণ কাঠুরিয়ার এই বাহাদুরীতে আমি অবাক্‌ হইয়া গেলাম। চুলোয় গেল এরির নীলজল আর উহার বুকে ভাসমান জাহাজগুলি। আমি জার্ম্মাণ কাঠুরিয়ার এই সফলতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। অনেক চিন্তার পর বুঝিলাম, জার্ম্মাণ কাঠুরিয়াকে ভুলাইবার মতো কোনো গুণই এরির ছিলনা। কাজেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে একমনে তাহার কাজে লাগিয়া থাকিতে পারিত। এই একাগ্রতার জন্যই জার্ম্মানটী, খুব জোরে এবং চট্‌পট্‌ কুড়ুল না চালাইয়াও, আমার সমান চলিতে পারিয়াছিল। একাগ্রতা কি বস্তু তাহা এই জার্ম্মাণ কাঠুরিয়াটীর কাছেই আমি শিখিয়াছিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয়ে অভ্যস্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এই কাঠ-কাটার ব্যাপারে কথায়-কথায় একদিন দিদিকে আমার সমুদ্র-যাত্রার ইচ্ছাটা জানাইলাম। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিতে দিদিকে কোনোই বিবেচনা করিতে হয় নাই। দিদি বলিলেন, "তুমি সারাজীবন কাঠ কাটিয়া কাটাও তা'ও ভালো, তবু নাবিক হওয়া মোটেই ভালো নয়।" কি নারী কি পুরুষ, কি আত্মীয় কি পর, সকলেই আমার মতের বিরুদ্ধে। তাহারা উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ধার ধারে না, অসীম অসম্ভব কিছু কল্পনা করিতে চাহে না—জানে না—পারে না। শুধু জানাশুনা পথে, জন্মের পর হইতে যে ভাবে পা-ফেলিয়া চলিতে শিখিয়াছে তাহার এদিক ওদিক হওয়াটা তাহারা মোটেই পছন্দ করেনা। তাহারা মরণের চেয়ে জীবনের দামটাই বুঝে বেশি। এইসব দেখিয়া শুনিয়া সমুদ্র-গমনের চিন্তাটা চাপা দিয়া গাছকাটাতেই মন দিলাম। গাছকাটা শেষ হইলে দেখিলাম, দৈনিক মাত্র দুইটী হিসাবে গাছ কাটা হইয়াছে। একমনে কাজ করিয়া গেলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর দিনে আড়াইটা করিয়া গাছ আমি কাটিতে পারিতাম।

আমার দিদির কতকগুলি ভালো ভালো বই ছিল। আমার কাকার ছিল আরো বেশি এবং দামী বই। আমার কাকা একখানি সংবাদ-পত্র লইতেন, আমি প্রাণ ঢালিয়া কাগজখানি পড়িতাম। বইগুলি ভালো বলিলাম বলিয়া

বারটোন মহাশয়ের কন্যার বইগুলির মতো যেন মনে করিবেন না। এই সকল বইয়ের পাঠক হিসাবে সভ্য-সমাজের যে কোনো সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে পারা যায়। আমি প্রতিদিন গাছকাটা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াই ঐ সকল বই লইয়া পড়িতে বসিতাম। কি ভাবে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়া গভীর রাত্রির কবলে আসিয়া পড়িতাম, তাহা আদৌ টের পাইতাম না।

কাজ শেষ হইয়া গেলে কাকা হিসাব করিয়া আমাকে ১৫৬।০ আনা দিয়া বলিলেন, যদিও একাজ মন্দ নয় তথাপি তাঁহার মনে হয়, আমার পক্ষে লেখা পড়া করাই কর্ত্তব্য। এবিষয়ে আমার মত জানিতে চাহিলে আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ"। সমুদ্র-গমনের কথাটা উচ্চারণ করা অবধি এ পর্য্যন্ত কাহারো কাছে যখন এতটুকুও উৎসাহ পাই নাই, তখন কাকার কাছে আর সে কথা না তোলাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। মনের কথা প্রকাশ করিলে লাভের মধ্যে শুধু গাল-মন্দই শুনিতে হইত।

অতঃপর একদিন কাকা ও দিদির নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী রওনা হইলাম। দিদির বাড়ীতে খাইখরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট ছিল, বাড়ী আসিয়া তাহা মা'র হাতে দিলাম।

সেই বৎসর জুনমাসের শেষ সপ্তাহে কাকা খবর দিলেন, মাইল ৫।৬ দূরে চাষের কাজের জন্য জুলাই হইতে চার মাসের

জন্য একজন লোকের দরকার। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ কাজে লাগিয়া গেলাম। বলা বাহুল্য, এখানেও কর্ত্তব্যবোধে চুক্তির অতিরিক্ত অনেক কাজই আমি করিয়াছিলাম। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম আমার মনিব নানাদিক হইতেই আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঐ প্রশংসাটা মন্দ কিছু না হইলেও ইহাকে বড় লোভনীয়ও আমি কিছু মনে করি নাই। কারণ, দরদ দিয়া এবং বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে থাকিলে, কোথাও কেহ অপদস্থ বা অপমানিত হয় না, আর তার ফলে প্রশংসা লাভও ঘটিয়া থাকে। আমার বিবেচনায়, চাকরের পক্ষে আন্তরিকতার সহিত কাজ করিয়া যাওয়া উচিত। প্রশংসা করা-না-করা মালিকের ইচ্ছা। শিক্ষিত লোক চাকুরী গ্রহণ করিলে তাঁহার কর্ম্মের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর হইতে বাধ্য। প্রশংসাটা চাকরের পক্ষে উপরি পাওনার সামিল।

এখানে কোনো ভালো বই পাইলাম না। লোকদের যথেষ্ট চরিত্রবল ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা পুঁথিপত্রের ধার আদৌ ধারিত না। তাহারা উদয়াস্ত চাষের কাজ করিত, এবং "কাজের ভিতর ছিল দুই, খাই আর শুই"।

এখানে একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার জল-যাত্রার কথাটা পাড়িতেই আমার মনিব মারমুখো হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "চুপ, আর একটী কথাও না। সমুদ্র-যাত্রার চেয়ে বরং আলুতোলা ভালো।" বোধ হয়, স্নেহবশতঃই

আমাকে আর কিছু তুলিতে বলেন নাই। আমিও চুপ করিলাম। সাধারণ মানুষ নিজের কাজের চেয়ে অপরের কোনো কাজ ভালো মনে করে না, আর নিজের জ্ঞানের বাহিরে আর কোনো জ্ঞান থাকিতে পারে, তা স্বীকার করিতে রাজি নয়। দিদির সামনে ছিল গাছকাটা আর ইঁহার সামনে ছিল, আলুতোলা।

যাহাহোক, চার মাস পরে ১৫০৲ টাকা লইয়া বাড়ী রওনা হইলাম। মনিব বিদায়কালে বলিলেন, "জান্‌লে বাপু, তোমার কাজে আমি বড্ড খুসি হয়েছি।"

১০

বাড়ী ফিরিয়া টাকাগুলি মা'র হাতে দিয়াই আমার কর্ত্তব্য শেষ করিলাম। মা'র সঙ্গে বিশেষ কোনো কথাবার্ত্তা হইল না। আমার তখন কথা কহিবার মতো শক্তি এবং প্রবৃত্তি দুইই যেন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। খুব সম্ভব আমার এই মনোভাব মা'র চোখ এড়াইতে পারে নাই। তখনো শীতকাল চলিতেছিল কাজেই, বসন্তকালের চাষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শহরে মাঝে-মাঝে ঠিকা কাজ করিতেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য কাজকর্ম্ম চলিতেছিল বটে, কিন্তু সে চলার ভিতর পূর্ব্বের আমার 'আমি' আর ছিল না। আমার চিত্ত তখন বিষম অস্থির—কল্পিত নাবিক-জীবনের তাড়নে। "পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ" ভালো নয় বিবেচনা করিয়া, একদিন মা'র কাছে আমার প্রবল ইচ্ছাটা জানাইয়া ফেলিলাম। আমার ধারণা ছিল, মা'র কাছে একথা বলায় কিছুই লাভ নাই!

হঠাৎ মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাহাজে চড়িয়া কোথায় যাইতে চাও? জবাব দিলাম, কোনো নির্দ্দিষ্ট জায়গা নাই; আমি শুধু এই দুনিয়াটার কিছু কিছু দেখিতে চাই।

—"সেকি! কোথায় যাইবে তাই তোমার ঠিক নাই! আমাকে যদি কোথাও যাইতে হয়, তবে আগেই আমাকে যাওয়ার জায়গাটা ঠিক করিতে হইবে—ইয়োরোপ, এশিয়া, না আফ্রিকা—কোথায়?"

আমি বলিলাম, "আটলান্টিক মহাসাগর পার হইতে চাই।"

মা বলিলেন, "যদি সেখানে অসুখ-বিসুখ হয় তবে? তারপর জাহাজী জীবন কি রকম তাহা তুমি মোটেই জানোনা, যদি ভালো না লাগে তখন?"

কথা-বার্ত্তায় বুঝিলাম, মা'র ভূগোলের জ্ঞান বেশ টন্‌টনে। আটলান্টিক মহাসাগর কত বড় তাহা আমরা যতটুকু জানি, মা-ও ঠিক ততটুকুই জানেন, একটুও কম কি বেশি নয়। ভূমধ্যসাগর, এমন কি চীনসাগর কোথায় তাও মা'র ঠিক জানা আছে। বুঝিলাম, তর্ক করিয়া মাকে হটানো মুস্কিল আর সে চেষ্টাও বৃথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মা কোনো বিষয়ে বিবেচনা না করিয়া কথা কহিতেন না। এতখানি কথা-বলার ভিতর নিশ্চয়ই তাঁর কোনো মতলব ছিল। এবিষয়ে দু'চারটা কথা বলিয়া আমার মনের ভাবটা একটু পাতলা করিয়া দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কি না, কে জানে। যাহাহোক, আমি শেষ পর্য্যন্ত বলিলাম, "মা, তুমি যদি মত না দাও তবে আমি সমুদ্রে কেন কোনো জায়গায়ই যাইব না!"

খানিকক্ষণ পর মা বলিলেন, "এরির কোনো মালের নৌকায় আগে যাইয়া দেখ না, কেমন লাগে। যদি ভালো না লাগে তাহা হইলে বাড়ী আসিতে কোনো কষ্ট হইবে না।"

মা'র কি উদ্দেশ্য তাহা যে কতকটা না বুঝিলাম এমন নহে। যাহা হোক, "মোটে মা রাঁধেনা, তপ্ত আর পান্তা।" এই পর্য্যন্ত যে মা'র আদেশ পাওয়া গেল এই ঢের মনে করিলাম।

যথাসম্ভব সত্বর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আবশ্যক টাকা এবং জিনিষপত্রের একটা ছোট বাণ্ডিল সঙ্গে লইয়া মাকে প্রণাম করিয়া ক্লীভল্যাণ্ডের দিকে রওনা হইলাম। যাইবার সময় মা'র চোখ হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। বাড়ী হইতে আমার গন্তব্য স্থান সতের মাইল পথ। পায়ে হাঁটিয়া বেলা বারোটার ভিতর সেখানে পৌঁছিলাম। কি ঘরে কি বাহিরে, কি ছোটবেলায় কি আজ পরিণত বয়সে মা আমার অন্তরে সর্ব্বদাই জাগিয়া রহিয়া আছেন। কিন্তু সেদিনটিতে যেন আরো নিবিড়ভাবে তাঁহাকে কাছে পাইয়াছিলাম।

বরাবর জেটীর দিকে রওনা হইলাম। পয়লা নৌকায় উঠিয়া একজন মাল্লাকে বলিলাম, "এখানে আর লোকের দরকার হইবে কি ?"

লোকটি বলিল,—"কাপ্তেন এখনই আসিতেছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

আমি ইতিপূর্ব্বে বইয়ে কাপ্তেনদের বিষয় যাহা যাহা পড়িয়াছিলাম, আজ সেই বলিষ্ঠদেহ, ভদ্রভাবাপন্ন, মহত্ত্বব্যঞ্জক এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিব ভাবিয়া সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যে নাবিকটীকে কাপ্তেনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার আর দেখা পাইলাম না। হঠাৎ নৌকার নীচের তলায় একটা ভয়ানক গোলমাল শোনা গেল, যেন একটা জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত। তারপর যাহা যাহা শুনিলাম, তাহা হয়ত কাগজে কলমে আপনাদিগকে ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিবনা, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, মানুষের কণ্ঠস্বর একটা বিপুলকায় ষাঁড়ের আওয়াজের চেয়েও বেশি জোরে, কোনো লোকের অথবা কোনো বস্তুর উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় অনর্গল গালি দিতেছিল। তাহা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল, নরককুণ্ডের কাপ্তেনই এরূপ জঘন্য ভাষায় গালাগালি করিতে পারে,— কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সময় আমার কি যে করা উচিত তাহা ভাবিয়া আমি কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া হতভম্ভ হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময়ে কাপ্তেন সাহেব দেখা দিলেন একটা পুরাদস্তুর মাতাল,

এবং ক্রোধোন্মত্ত জানোয়াররূপে। তাহার পা-দুইটী যেন এক-একটী মদের পিঁপা আর মুখটী পিঁপার ছিদ্র। সেই ছিদ্র দিয়া মদ্যপানের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যতদূর সম্ভব জঘন্য ভাষা নির্গত হইতেছিল।

আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক অশিক্ষিত সাধারণ লোককে যথেষ্ট গালমন্দ করিতে শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কাপ্তেনের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাই নাই। আগে এই রকমের কিছু আভাস পাইলে আমি আর সেখানে সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম না। এক মুহূর্ত্ত লোকটার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অনেক কিছুই ভাবিলাম। সেই লোকটাও আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাপ্তেন সাহেব, আপনার এখানে লোকের দরকার আছে কি?" জবাব যাহা পাইলাম তাহা আর কাগজের পৃষ্ঠে লিখিয়া না-রাখাই ভালো। কাপ্তেনের গালির প্রসারতা মিসিসিপি ও আমাজনের চেয়ে বোধ হয় কম ছিল না, কিন্তু উহার গভীরতা যে ইহাদের উভয়ের চেয়ে অনেক বেশি ছিল সে বিষয়ে ইতস্ততঃ করিবার কোনো কারণ নাই। শুধু আমিই নই, আমার পিতা-মাতার ভাগ্যেও সেইসব গালমন্দের কিছু কিছু লাভ হইয়াছিল। অযথা আর অধিকলাভের আশা না রাখিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

এই রকম একটা ব্যাপার যে ঘটিবে তা আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। আমি অনেক কাপ্তেন এবং নাবিকের কাহিনী পড়িয়াছি, কিন্তু এই রকম একটা কাপ্তেনের বিবরণ কখনো শুনি নাই কিংবা পড়ি নাই। সঙ্গে সঙ্গে তখন একটা ভাবনা আসিল, তাহা হইলে পুস্তকে যাহা লেখা থাকে তাহা কি সব সময়ে সত্য নয় ?

এই ঘটনায় আমার সমুদ্র-গমনের প্রবল ইচ্ছা দমিয়া যাইবার মতো হইল। জাহাজ হইতে যেমন নামিয়া পড়িলাম, অমনি সেই মাতাল কাপ্তেন সহজ স্বরে আমাকে নাবিক হইতে নিষেধ করিল। আমি এবারেও অবাক্ হইয়া গেলাম। মানব-জীবনের রহস্য আর এক নূতন ভাবে উপলব্ধি করিলাম।

বাড়ী হইতে যাইবার সময় মা কিছু খাবার দিয়াছিলেন। এক স্তূপ কাঠের উপর বসিয়া তাহাই খাইতে খাইতে জগতের নানা ভাব এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। কাপ্তেনের এই রকম ব্যবহারের কোনো কারণই আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। মানুষ, ভালোর দিকেই হোক আর মন্দের দিকেই হোক, একটা কূল চায়। অকূলে-অথাইয়ে সে থাকিতে চায় না,—থাকিতে পারেনা বলিয়াই সে উহা চাহেনা। তাই আমিও ভাবিয়া ভাবিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম যে, একে

আমার কম বয়স, এ-পথের নূতন পথিক এবং বেশ-ভূষাও গ্রাম্যধরণের, তার উপর ক্ষার-কারখানার কর্ম্মচারী, কাঠুরিয়া এবং চাষী আমি, কিভাবে কাপ্তেনের সাম্‌নে হাজির হইতে হয় এবং কথাবার্ত্তা চালাইতে হয়, তাহা না-জানার ফলেই হয়ত এরূপ ঘটিয়া থাকিবে। যতই এবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই মনে হইতে লাগিল, কাপ্তেনের অপরাধ তত নয়, যতটা আমার নিজের।

এখন কি করা উচিত তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এত তাড়াতাড়ি এ-পথটা ছাড়িয়া দেওয়ারও ইচ্ছা ছিল না। "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি" মনে করিয়া জেটির উপরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। এমন সময় হঠাৎ পেছন দিক হইতে আমার ডাকনাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম।

ডাকটা আসিয়াছিল একখানি মালের নৌকা হইতে এবং ডাক দিয়াছিল আমার এক আত্মীয় ভাই। দুইজনেই দুইজনকে দেখিয়া যারপরনাই অবাক্ হইয়া গেলাম। এরির ধারে আমার গাছকাটার খবর পর্য্যন্ত সে রাখে দেখিলাম। যাহা হোক, আমি তাহাকে আমার ইচ্ছা জানাইলাম। ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও চেষ্টা করিয়াছি কিনা সে জিজ্ঞাসা করিলে আমি আগাগোড়া এই ঘটনাটা তাহাকে বলিলাম। সে বলিল, এই প্রকৃতির কাপ্তেনই নাকি বেশি ; এই রকম লোকের সঙ্গে আমার

পোষাইবে না, উহার চেয়ে গাছকাটা সে অনেক ভালো মনে করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের এখানে বা অন্যত্র লোকের দরকার আছে কি ? সে বলিল, "আমরাই একজন ড্রাইভার চাই।" কথায়-কথায় জানিলাম, সে-ই ঐ নৌকার কাপ্তেন। আমি ইহাতে খুবই সুখী হইলাম। আমার কাজটী কি রকমের হইবে একটু শোনা গেল। জঙ্গলে কাঠুরিয়ার কাজের চেয়ে যে ইহা অনেক সহজ, তাহা সে বারবার আমাকে বলিল। জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা এখন কোথায় যাইতেছ ?

—"পিট্‌স্‌বার্গ।"

—"নৌকায় কি বোঝাই আছে ?

—"খনির তামা।"

সে আমার ভাই হইলেও সেখানে তাহার একটা বড় রকমের সম্মান আছে এবং সেটা আমার লক্ষ্য করা উচিত। সেইজন্যই আমি তখন হইতে কাজের সময়ে তাহাকে কাপ্তেন বলিয়া সম্বোধন করিতাম। বলিলাম, কাপ্তেন, আমি এখানে কাজ গ্রহণ করিব। মাসে কত দিবে ?"

—"মাসে ৩৭৷৷০ টাকা। ড্রাইভারকে আমরা এই বেতনই দিয়া থাকি।" "কাল ভোরে আমরা নৌকা ছাড়িব,—যদি রাজি হও তৈরী থাকিও"।

আমাদের নৌকার নাম ছিল "ঈভ্‌নিং ষ্টার"। "ঈভ্‌নিং

ষ্টার’-এর ১৯০০ মণ মাল বহিবার ক্ষমতা ছিল। কাপ্তেন বাদে দুইজন মাঝি, দুইজন ড্রাইভার, একজন বাউম্যান এবং একজন পাচক—মোট সাতজন লোক ঈভ্‌নিং ষ্টার-এ, কাজ করিত। ড্রাইভারদের কাজটা কি তাহা জানিয়া লইলাম। একজন ড্রাইভার একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দুইটী খচ্চর লইয়া কাজে লাগিত। তাহার কাজ ছিল নৌকা চালাইয়া লইয়া যাওয়া। সময় উত্তীর্ণ হইলে সে তাহার খচ্চর দুইটী লইয়া নৌকায় আসিত, তখন অপর ব্যক্তি দুইটী নূতন খচ্চর লইয়া আবার কাজে লাগিত।

মাঝি-মাল্লাদের জাত্‌টাই ছিল অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত এবং গোঁয়ার প্রকৃতির। দুশ্চরিত্র, দুর্বিনীত, ইতর এবং মাতালের উপাদানে একটী মানুষ গড়িয়া উঠিলে যাহা হয়, ইহারা জনে-জনে ছিল ঠিক তাহাই। সাধারণতঃ মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে ভাত-ডালের যে প্রয়োজন, ইহাদের নিকট তাঁড়ি এবং কড়া তামাকের ছিল ঠিক সেই প্রয়োজন। ইহারা চরিত্রের কোনো ধার ধারিত না, ধর্ম্মও ছিল তথৈবচ। সেই হইত দলের ভিতর সব চেয়ে সেরা লোক, খাতির ছিল দলের ভিতর তারই সব চেয়ে বেশি, যে সকলের চেয়ে বেশি মদ খাইতে এবং কুৎসিত গান গাহিতে পারিত। কাজেই আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে কি এক সঙ্গীন জায়গায় তখন আমি দাঁড়াইয়াছিলাম।

এই কুসঙ্গকে আমার মনুষ্যত্ব-লাভের পক্ষে, এক নূতন পাঠশালার, এক কঠোর পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু আপনারা বলিতে চাহেন কি ?

পরদিন প্রভাতে আমি নৌকায় হাজির হইলে সর্ব্বপ্রথম আমাকেই ড্রাইভারের কাজে বহাল করা হইল। কাপ্তেন আমাকে আবশ্যক উপদেশ দিয়া দিলেন। তখনকার মতো যতটুকু বুঝা দরকার তা ঠিকই বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু যে অবস্থায় যতটুকু রাশটানা অথবা দম দেওয়া দরকার সে বিষয়ে পুরা জ্ঞান না-থাকায়, একটা পুল পার হওয়ার সময় এক মহাবিপদের সৃষ্টি করিয়া ফেলিলাম। খচ্চর দুইটীসহ গভীর জলে পড়িয়া গেলাম। খচ্চর দুইটীকে ও আমাকে উদ্ধারের জন্য সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সেই কয়েক মিনিট সময় খচ্চর দুইটী লইয়া জলের ভিতর আমাকে যে কি কাণ্ড করিতে হইয়াছিল, তাহা যদি কেহ আমার অবস্থায় কখনো পড়িয়া থাকেন তবে তিনিই ইহা ভালোরূপে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হোক, হাঁসের মতন ডুবপাড়া ছাড়া আর কোনো অসুবিধা আমার হয় নাই।

একজন মাঝি বলিল, "আজ তোমার ঠিক ঠিক দীক্ষা স্নান হইয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আনাড়ি মাল্লাদের আমরা এই রকমেই পাকাইয়া তুলি, জান্‌লে।" সকলের শেষে কাপ্তেন বলিলেন, "আচ্ছা জলের ভিতর ডুবিয়ে ডুবিয়ে

তুমি করছিলে কি, বলতো ?" যাকে যে ভাবে পারিলাম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়া খুসি করিলাম। সে দিনটায় তো আমার জলে-পড়া লইয়া ঠাট্টা-তামাসা চলিয়াছিলই, পরেও দিন কতক উহার জের চলিয়াছিল বলিলেই ঠাট্টার জোর সম্বন্ধে অনেক খানি বলা হইল, আশা করি।

আমার কাজের সময় উত্তীর্ণ হইলে কাপ্তেনের আদেশে, নূতন লোক দুইটী নূতন খচ্চর লইয়া হাজির হইল, আমি আমার খচ্চর লইয়া নৌকায় উঠিলাম। এইবার কাপ্তেনের নিজের ঘরে বসিয়া বন্ধুভাবে আমাদের গল্পগুজব চলিল। ইস্কুলে আমরা যে যতটুকু পড়িয়াছিলাম, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা-বাদ চলিল। আমি তাহার সকল প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারিয়াছিলাম। কাপ্তেন খুবই খুসি হইয়াছিলেন। উহারই আতিশয্যে বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে তোমাদের যে আত্মীয়তা আছে, আশা করি, তাহা শুনিয়া তুমি লজ্জিত হইবেনা—তুমি আমার মাসতুতো ভাই হও।"

আলাপের শেষে কাপ্তেন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কাঠুরিয়া এবং মাল্লা হওয়ার জন্য যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি থাকা দরকার, তোমার তাহার চেয়ে ঢের বেশি আছে।" আমি বলিলাম,—

"সত্যই কি তাই ?"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমি মিথ্যা বলিতেছি না। তুমি আর

কিছুদিন ইস্কুলে গেলেই মাষ্টারী করিবার মতো জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।"

আমার নাবিক জীবন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল মতামত পাইয়াছি, সে-ও অনেকটা এই রকমেরই ছিল। কিন্তু আমার মা'র মতের সঙ্গে তাহার মতের একটা জায়গায় মিল ছিল—সেটা আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। তাহার কথার ভিতর এতখানি জোর এবং সহৃদয়তা ছিল যে, আমি অন্তরে অন্তরে তাহার মতে মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

১১

এই সকল মাঝি-মাল্লারা কথায় কথায় কুৎসিত শব্দ জুড়িয়া যেমন শপথ করিত, যখন তখন তেমনি মারামারি করিতেও ছাড়িত না। গায়ের জোর সকল জায়গায়ই ইহারা খাটাইয়া চলিতে চাহিত। বিবেকের কোনো ধারই ইহারা ধারিত না। আসল কথা, বিবেক বলিয়া কোনো পদার্থই ইহাদের ভিতরে ছিল না। যদি কখনো কাহারো কাছে বশ্যতা স্বীকার করিত, তবে তাহা বিচার বিবেচনার ফলে নহে, গায়ের জোরের কম্‌তির জন্যই। অপরের সত্যকার দাবী, দাবী বলিয়া মানিয়া লওয়া ইহারা কাপুরুষতা মনে করিত। নিজের মিথ্যাকে বড় করিবার জন্য ইহারা না করিতে পারিত এমন কাজ ছিল না। মোট কথা, অজ্ঞতার কুফলগুলি ইহাদের চুলের ডগা হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বত্র এক একটা পীঠস্থান করিয়া বসিয়াছিল।

জগতে অশিক্ষিত এবং তথাকথিত অসভ্য জাতি ও সম্প্রদায় অনেক আছে, কিন্তু ইহাদের মতো কুশিক্ষিত ও ইতর প্রকৃতির লোক আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ! এক

সময়ে চল্‌তি পথে অপর এক নৌকার মাল্লাদের সহিত আমাদের নৌকার মাল্লাদের বিবাদ বাধে। ঝগড়া মিটাইবার জন্য নহে, সত্যের দিক হইতেই আমি অপর পক্ষের দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। ইহার ফলে আমাদের নৌকার সাহসী মাল্লারা, তাহাদের বিচারে যত রকমে সম্ভব আমাকে নীচু করিতে ছাড়ে নাই। আমার মতো ভীরুর পক্ষে কাঠকাটা, গাভী দোহন করা এবং চাষের কাজই নাকি শোভা পায়,—এই সব নৌকার কাজ আমার জন্য নয়! কারণ আমি মারামারি করিতে রাজি ছিলাম না, এবং সাহস নাই বলিয়াই নাকি তাহা পারিতাম না।

আমাদের নৌকা তখন পিটস্‌বার্গের পথে। একদিন একটা কাছির বাড়ি লাগিয়া একজন মাল্লার টুপীটা উড়িয়া গিয়া নদীতে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে সে আমার উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া যায়। এই দুই কারণে সে আমাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিল। কারণ আমিই তাহাকে এই ঘটনার জন্য পূর্ব্বে সাবধান করিয়াছিলাম। অতঃপর আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, সে অসংযত উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো মাথা নীচু করিয়া, তাহার টুপীটা যেখানে গিয়াছে আমাকে সে জায়গাটা দেখাইয়া দিবার জন্য আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। আমি বেগতিক দেখিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম এবং

তাহার কানের পাশে এক জোর ঘুসি মারিয়া, নৌকার ভিতর যেখানে তামা বোঝাই ছিল সেখানে ফেলিয়া দিলাম। তারপর ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য, তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলাম। খানিকক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকার পর লোকটা আমাকে উঠিয়া পড়িবার জন্য অনুরোধ করিল। আপনারা আশ্চর্য্য হইবেন, অতঃপর সে আমার পরম বন্ধু হইয়াছিল, এবং মাঝিমাল্লাদের ভিতর মানুষের মতো একটা মানুষ বলিয়া আমার যথেষ্ট খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। আমার খাতিরও বাড়িয়াছিল কম নয়। সকল সময়ে এক নীতিতে মানুষের সঙ্গে প্রীতি স্থাপন এবং মানুষকে মানুষ করা যে যায় না, এই ঘটনার পর হইতে আমার এই জ্ঞানই হইয়াছিল!

মাল্লাদের ভিতর হ্যারি ব্রাউনের অন্তরটা ছিল খুবই চমৎকার! অমন হৃদয় আমি খুব কমই দেখিয়াছি। অবশ্য অন্যান্য দোষ যে তাহার ছিল না, তাহা নহে। সে আমাকে খুবই ভালোবাসিত। আমার জন্য কোনো কাজ তাহার নিকট অসাধ্য ছিল না। হ্যারি অত্যন্ত মদ খাইত এবং তাহার ফলে প্রায়ই কষ্ট পাইত। আমি সেজন্য যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিতাম। আমি একদিন তাহাকে মদ খাওয়ার কুফল বুঝাইতে বুঝাইতে অনেক কথাই বলিলাম, সে চুপ করিয়া শুনিয়া গেল। আমার বিশ্বাস

সেই নৌকায় আর কাহাকেও ঐ রকম উপদেশ দিলে সে খাড়া জবাব দিত, "তোমার কি হে বাপু! নিজের চরকায় তেল দাও।" কিন্তু হ্যারি আমাকে বলিল, "তাতো বুঝি ভাই চ কিন্তু—"। আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "তোমার কোনো কথাই আমি শুনিব না, হ্যারি! নেশার ভিতর মদের মতো এমন অনিষ্টকর পদার্থ আর নাই। তার চেয়ে এই খালের নানা রকমে ময়লা জল শতগুণে ভালো। তুমি ইচ্ছা করিলে যা হইতে পার, তার জন্য তুমি এক তিল চেষ্টাও কর না। বোতল ভাঙিয়া ফেল, দেখিবে তোমার মহান্ হৃদয় দৃপ্ত সূর্য্যের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমি বুঝিতে পারি না, কেন তোমরা অন্য লোকের মতো সভ্য হইতে চাও না! আমি তোমাদের পশুর মতো জীবন-যাপন একদম পছন্দ করিনা। যে মানুষ, সে কেন জানোয়ারের মতো হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে!" কথাটা হ্যারির অন্তরে বাজিয়াছিল, সে আমাকে বলিল, "জেম্‌স্' আমার আত্মসম্মান-জ্ঞান আমি একদম হারাইয়া ফেলিয়াছি। যদি আমি নিজেকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত হীন হইতাম না। আজ দুঃখ এই যে, আমার নিজের কোনো আত্মসম্মানবোধ আর নাই!" তাহার এই কথা আমারও অন্তরে খুব বাজিয়াছিল। হ্যারি অতঃপর আমার কথা ধীরে ধীরে পালন করিতেছিল।

এই রকমে শুধু আমাদের নৌকায় নয়, অন্যান্য নৌকার মাঝি-মাল্লারাও ক্রমে ক্রমে সভ্য হইবার চেষ্টা করিতেছিল। সেই দিনের মাঝি-মাল্লাদের অনেকেই এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহাদের অনেকে না-হোক দুই-একজনও যদি ঐ সকল কুপথ ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তাহাই আমার পক্ষে পরম গর্ব্বের বিষয়! গড়িয়া তুলিতে পারিলে মানুষ মানুষই হয়। তাহার ভিতরটাতো আর ইটকাঠ নয়! এইমাত্র যে অজ্ঞ অশিক্ষিতকে আমি ঘৃণা করিতেছি, আর একজনের হাতের পরশে সেও একদিন পরশমণি হইয়া যাইতে পারে। আমি জানি, আমার যেমন ভালোকথা বলিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা আছে, তাহারাও উহা হইতে বঞ্চিত নহে। আমি ঐ সকল চরিত্রহীন লোককেই একাধিকবার আমার প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি—নিজেদের ভিতর গল্প-গুজবের ছলে নহে,—অপরাপর নৌকার মাঝি-মাল্লাদের নিকটও! উহারা অপরের প্রশংসা পাইতে বঞ্চিত হইয়াছে সত্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে শতগুণ ঘৃণার পাত্রও হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাদের চিরকর্দ্দমিত হৃদয়েও একদিন প্রফুল্ল কমল ফুটিয়া উঠিতে পারে, সে ভরসা আমার আছে। কারণ, নিজেরা চরিত্রহীন হইলেও ইহারা অপরের চরিত্রের মর্য্যাদা দিতে শিখিতেছে।

বড় জোর মাস তিনেক মালের নৌকায় কাজ করিয়াছিলাম। এই তিন মাসের ভিতর চৌদ্দবার আমি জলে

পড়িয়াছিলাম। প্রথম প্রথম অবশ্য অজ্ঞতার জন্যই দুই-একবার এই রকম ঘটিয়াছিল। গা-বাঁচাইয়া কাজ করার বুদ্ধি বা শিক্ষা আমার কোনোকালেই ছিল না বলিয়াই, আমাকে বারবার জলে পড়িতে হইয়াছিল। আমি আমার যুবক বন্ধুদিগকে বলিতেছি, "যে কাজ হাতে লইয়াছ তাহাতে তন্ময়তা আসা চাই। কর্ম্মে দরদ না থাকিলে তন্ময়তা আসিতে পারে না। এই তন্ময়তা এমন বস্তু যাহা লাভ করিয়া মানুষ মৃত্যুর সাম্‌নে যাইয়াও সোজা দাঁড়াইয়া থাকে। অপমান অত্যাচারের প্রতিশোধ না-লইয়া সে ঘরে ফিরে না! কাজেই বন্ধুগণ, কর্ম্ম, কর্ম্ম! শুধু আপনা ভুলিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও, তবেই প্রাণে শান্তি পাইবে।"

শেষবার যখন আমি জলে পড়ি, তখন আমার জীবন ভয়ানক ভাবে বিপন্ন হইয়াছিল। একরাত্রিতে আমি বেশ আরামে ঘুমাইতেছিলাম, তখন টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছিল। পালা-অনুসারে কাজ করিবার জন্য হঠাৎ আমার ডাক পড়িল। তখন আমার চোখের ঢুলু-ঢুলু অবস্থা। কেন যে ডাকা হইয়াছে, কোথায় তখন আমি, কে ডাকিল তাহা আমি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলাম না। অতঃপর নৌকাখানা যখন কোনো ঘাঁটিতে পৌঁছিয়া থামিতে যাইবে, তখন হঠাৎ কাছির বাড়ি লাগিয়া আমি গভীর জলে পড়িয়া গেলাম। একে রাত্রি গভীর, তার উপর "ঘনতমসাবৃত

অম্বর-ধরণী”। উপরে মেঘের অবিরাম গর্জ্জন, নিম্নে ঝঞ্ঝাবৃষ্টি। কালো জল অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নিজেকে আরো কালো করিয়া তুলিয়াছিল। নৌকাখানিতে অনবরত ঢেউয়ের ঝাপ্‌টা লাগিতেছিল। নৌকার কেহ জানিতেই পারে নাই যে, আমি জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম। ধারে কাছে আশ্রয়ের জন্য একগাছি খড় পর্য্যন্ত পাইলাম না, ভাবিলাম মৃত্যু নিশ্চিত। মরণকে সামনে জানিয়াও আমি উহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়ি নাই, বরং বাঁচিবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম। হঠাৎ সেই গভীর অন্ধকারে, সেই অথৈ জলে একগাছি কাছি আমার হাতে ঠেকিল। আমি উহা টানিয়া টানিয়া ধীরে ধীরে নৌকার উপর উঠিলাম। আপনারা হয়ত বলিবেন, আমার হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ার মতোই কাছিটাও হঠাৎ আমার হাতে ঠেকিয়াছিল। কিন্তু আমি তখন উহা মনে করিতেই পারি নাই, আর মনে করিতেও চাহি নাই। কোনো অদৃশ্য শক্তির করুণা ভিন্ন সে রাত্রিতে আমি কোনো মতেই বাঁচিতে পারিতাম না।

জল হইতে উঠিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িবার সময় আমার হইল না। আমি আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার, দুইবার, বারবার ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, আমার জীবন বোধ হয় ভগবানের অভিপ্সীত, তাই তিনি

রক্ষা করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কে এমন অবস্থায় আমাকে রক্ষা করিতে পারিত! সমুদ্র-গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া এইবার পড়া-শুনা আরম্ভ করিব, এই সংকল্পও তখন মনে উঠিয়াছিল।

জল হইতে উঠিয়া ভগবানের অপার করুণা উপলব্ধি করিলাম বটে, কিন্তু আর একজনের উদ্দেশ্যে মনটা আমার তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল,—প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলাম, বারবার ডাকিলাম, কিন্তু তথাপি শান্তি পাইলাম না। ভাবিলাম, আর একবার ডাকিলেই বোধ হয় শান্তি পাইব। কিন্তু প্রতিবারেই ঐ অবশিষ্ট এককে ধরিবার জন্য আমার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া মরিতেছিল—তিনি আমার মা। আমি জানিতাম, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত মা আমার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। তখন একে-একে আমার জন্য তাঁহার নানা রকম ভাবনা এবং সদুপদেশগুলি উঁকি দিতে লাগিল। মনে আছে, সে সময় আর কিছু বলিবার মতো শক্তি আমার ছিল না। শুধু মনে মনে বলিলাম, "মা, তোমার কথা শুনিব, তোমার অন্তরে ব্যথা দিয়া কোনো কাজে যাইব না, ভবিষ্যতে ভালো হইব, নাবিক জীবন এইখানেই বিসর্জ্জন দিলাম।"

এই ঘটনার দিনকতক পরে আমি ভয়ানক ভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলাম। কাজ করিবার ক্ষমতা লোপ পাইল। আমি নাবিক জীবন বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ী যাইবার জন্য তৈরী

হইলাম। কাপ্তেন খুবই খুসি হইলেন। বিদায়ের কালে আমরা প্রত্যেকেই অন্তরে যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। তাহারা যত খারাপই হোক,—তাহারা মানুষ, আমার দেশবাসী, আমার স্বজাতি, আমার মাতৃভূমির সুখ-দুঃখের অংশীদার তাহারা,—আমি ঘৃণার চক্ষে তাহাদিগকে কখনো দেখি নাই।

সন্ধ্যার পর রওনা হইয়াছিলাম, কাজেই বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছিল। বাড়ীর কাছাকাছি হইয়া দেখিলাম, ঘর হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইতেছে। জানালা দিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম, ঘরের কোণে—মা যেখানে বসিয়া প্রত্যহ প্রার্থনা করিতেন ঠিক সেইখানে, হাঁটু গাড়িয়া মা বসিয়া আছেন—সাম্নে একখানা পুস্তক খোলা অবস্থায়—ঊর্দ্ধনেত্রে হইয়া একমনে বলিতেছেন,—"হে অনাথের নাথ, হে অগতির গতি আমার কোলে ফিরাইয়া আনো, তোমার দয়াময় নাম সার্থক হোক। তোমার সন্তানকে তোমার অসীম শক্তির কণিকা দাও। তোমার কন্যার জীবন রক্ষা কর।" বুঝিলাম, আমারই জন্য মা'র এই আকুল প্রার্থনা। ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। মা তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার উপর অজস্রধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

১২

মা আমাকে দেখিয়া যতটা খুসি হইয়াছিলেন, গৌণ কারণ হইলেও, তার দশ আনা আন্দাজ ছিল আমার নাবিক জীবন পরিত্যাগের জন্য। আমি আমার দুই তিন মাসের সমস্ত খবর মাকে বলিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার মা'র হৃদয় ভগবদ্বিশ্বাসে ভরপুর ছিল। ভগবদ্‌ভক্ত হওয়ার পক্ষে আমার নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকিলেও, তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণের ফলেই বোধ হয় তাঁহার কতকটা ভাব আমার ভিতরেও আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই কারণেই জলমগ্নপ্রায় অবস্থা হইতে রক্ষা পাওয়ার ফলে, আমি কতকটা ভগবদ্বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছিলাম। মা বুঝিলেন ভগবান আমাকে সুমতি দিয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। যাহা হোক, আমি আপাততঃ নাবিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া আবার যে ছাত্র-জীবনে প্রবেশ করিব, ইহা একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিলাম। মা'র আনন্দ দেখে কে!

মা'র দিক হইতে আমার শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য ছিল হয় শিক্ষক, নয় প্রচারক হওয়া। সদ্ভাবে চলিলে উকীল হওয়াতেও মা'র আপত্তি ছিল না। কিন্তু অসৎ উকীল

আর নাবিক যে একই শ্রেণীর জীব, ইহা মা'র স্পষ্ট ধারণা ছিল।

তখনো আমার শরীর ঠিক সারে নাই, দুর্ব্বলতা বেশ ছিল। প্রায় সময়ই শুইয়া থাকিতাম। এমন সময়ে আমাদের বাড়ীতেই একদিন এক যুবক ভদ্রলোকের সহিত মা আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভদ্রলোকটী আমাদের ইস্কুলের শিক্ষক। শিক্ষকোচিত নানাগুণে গুণীতো তিনি ছিলেনই, অধিকন্তু ধর্ম্মপ্রাণ। আমি শীতের ইস্কুলে তাঁহার কাছে পড়িব বলিতেই, মা খুব খুসি হইলেন। এমন কি পরবর্ত্তী শীতের সময়ে যাহাতে এই শিক্ষকের মতো আমিও কাজ করিতে পারি, সে বিষয়ে মা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শিক্ষকতা খুব ভালো কাজ, এইকথা মা'র কাছে অনেকদিন শুনিয়াছি, কিন্তু আজ এই ভালো কথাটী শুনিয়াও মনে যেন খুব আনন্দ পাইলাম না। আমার মন তখন আরো বড় কিছু চাহিতেছিল। মাকে বলিলাম, মা এই কাজে আমি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব কি না জানিনা। আমার সমুদ্র-গমনের ইচ্ছাটা আবার প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সমুদ্রের জলে কি যেন একটা আছে, যাহা সকল সময়ই আমার চোখের সাম্‌নে নাচিয়া বেড়াইতেছে। আমি চোখের সাম্‌নে জাহাজ দেখিতে পাই। বস্তুতঃ জাহাজের ডেক্ এবং কাছি

টানাটানির কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন আমি যে কোথায় থাকি, তা আমিই জানিনা। মা'র মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিলাম, মা'র প্রাণটা বহুদিন পরে আবার ভয়ানক ভাবে কাঁপিয়া উঠিল। মা বলিলেন, "তুমি যে আর কখনো নাবিকের কাজে যাইবে না বলিয়াছ, তবে আবার সে কথা কেন?" বলিলাম, শরীরটা সারিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার সমুদ্র-গমনের ইচ্ছাটা জাগিয়া উঠিয়া আমাকে যেন বলিতেছে, "বিপদ দেখিয়া ভয় পাইও না, বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হও, তোমার কাজ এখনো বাকি।" মা'র কঠোর জবাব পাইলাম, "কখনো তা হইবে না। তুমি যখন পড়াশুনার জন্য তৈরী হইয়াছ তখন পড়াশুনা কর। আমার বিশ্বাস সমুদ্রে নাবিকের কাজ করার চেয়ে শিক্ষকের কাজে পয়সা ও সম্মান দুইই আছে।"

মোটের উপর আমি চিরদিন এই একই বুঝ বুঝিয়া আসিয়াছি যে, যতদিকে যত রকমে সম্ভব মানুষকে হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া জীবন-সংগ্রামের জন্য ধারালো তলোয়ারের মতো হওয়া উচিত। জানি আমি, প্রত্যেক ক্ষেত্রে দক্ষতালাভ করা একটা জীবনে অসম্ভব, তথাপি অতলস্পর্শী সাগরের গভীরতম তলদেশ হইতে গগনচুম্বী পর্ব্বতের শিখরদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সার্ব্বভৌম বিজয়ীর মতো মানুষ ঘুরিয়া বেড়াইবে। কার্য্যকালে যেন কোথাও তাহাকে মাথা

চুল্‌কাইতে হইবে না ইহাই আমার তখনকার, এখনকার এবং সকল সময়কার ইচ্ছা। নাবিক জীবনে আমি দক্ষতা লাভ করিতে না পারিলেও যাহা কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, পরবর্ত্তীকালে তাহারই জোরে কাজে উৎরাইবার সাহস পাইয়াছিলাম। আনা আন্দাজ অভিজ্ঞতার সহিত আনা পরিমাণ নিখাদ সাহস মিশাইতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধির যথেষ্ট ভরসা করা যায়। তারপর কোনো কর্ম্মেরই ছোটবড় গুরুলঘু বিচার করা উচিত নয়। যাহার প্রয়োজন আছে —তা সে যত ছোটই হোক—তার একটা মূল্যও আছে এবং উহা নিতান্ত কম নয়। যে মানুষ সমাজের ভিতর আভিজাত্যের পক্ষপাতী সে তাহার কর্ম্মের ভিতরও একটা আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়া চলিতে চাহে। কর্ম্মের ভিতর তাহার নিজস্ব হাঁচিকাশি, হাসিকান্নার তরঙ্গ না দেখিলে সে তাহাতে মজিতে চাহে না। এক কথায় এই আভিজাত্যের ধারণা মানুষের নিজের মরণাস্ত্র তো বটেই, সমাজেরও প্রাণ সংহারক যন্ত্র।

আর একটা কথাও এখানে বলা দরকার মনে করিতেছি। আমরা প্রত্যেকেই সমাজ-দেহের অঙ্গ বিশেষ। উহার ভালো-মন্দ, গৌরব-অগৌরবের জন্য ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমরা প্রত্যেকেই দায়ী। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের অতি মাত্রায় স্নেহ ভালোবাসা সে দায়কে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়া পায়ে যেন

চিরদিনের মতো একটা শক্ত শিকল পরাইয়া দেয়। বয়সে ও জ্ঞানে আমরা যত বড়ই হইতে থাকি না কেন, তাহাদের নিকট আমাদের শিশুত্ব আর ঘোচে না। তাহারা "প্রাণ দিয়ে দুঃখ সয়ে আপনার হাতে" মানুষ হইবার সুযোগটুকুও সন্তানদিগকে দিতে চাহেন না। অনেক ক্ষেত্রেই অভিভাবকগণ জানেন না এবং বোঝেন না যে কেমন করিয়া সন্তানদিগকে মানুষ করিতে হয়। তাহারা নিজেদের খেয়াল মাফিক অনেক সময়ে যে সব নীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহার ফলে, আমার মনে হয়, অনেক মূল্যবান জীবন অনর্থক শাসনের অত্যন্ত চাপে চিরদিনের মতো চাপা পড়িয়া যায়। আমার নিজের পক্ষে সে রকম বাধা আমি পাই নাই সত্য, কিন্তু স্নেহ-মমতার বাঁধনটা ঠিক একই ভাবে দেখা দিয়াছিল। অভিভাবকগণের উক্ত দুই রকমের চাপা-চাপির ভিতর হইতে ফস্কাইয়া গিয়া যে সকল গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, কূলকিনারা হীন বিরাট সংসারের বুকে আগুপিছু না ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে, সেই তাহারাই ভবিষ্যতে আবার একদিন হঠাৎ লক্ষ্মীমন্ত গুণবন্ত হইয়া, কোটী কোটী নরনারীর মাথার উপর নিজেদের মাথা তুলিয়া, অভূতপূর্ব্ব জীবনের অনন্ত মহিমা বর্ণনা করিয়া অফুরন্ত সাহস ভরসা দিতে পারে।

একদিন সেই শিক্ষক মিষ্টার বেট্‌স্‌ আমাকে পঠন-পাঠন

সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। যে, যেদিক দিয়া বড় হয় সে মনে করে সংসারে বড় হওয়ার উপায় ঐ একটী, এবং মনুষ্যত্বের মাপ কাঠিটা শুধু ঐ পথের ধারেই পড়িয়া রহিয়াছে। শিক্ষকমহাশয়ের অনেক গুণ ছিল বলিয়াছি, কিন্তু বহুদর্শিতা ও দূরদর্শিতার রসে তাহারা পুষ্ট হইয়া উঠে নাই। "লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই" ইহার চেয়ে বড় কথা এবং দামী তথ্য ইঁহার নিকট আর কিছু ছিল বলিয়া মনে পড়ে না। আমার মনে হয়, ছেলে বেলা হইতেই গড়িয়া তুলিবার জন্য নানা বিষয় ছেলেদের জানাইয়া দেওয়া উচিত। অবশ্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা আর তার ভালোমন্দ দুইটা দিকই বলা দরকার। এই ভাবে আলাপ আলোচনার ফলে বয়স হইলে সে নিজের ফুটিবার পথ নিজেই করিয়া লইতে পারে। আমাদের আরও উন্নতি না হওয়ার আর একটা কারণ, আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব এড়াইয়া উঠিতে পারি না। সমাজ ও সংসর্গের আদর্শ বড় না হইলে উন্নতির পথে আরও বহুকাল সংসারকে খোঁড়া হইয়া থাকিতে হইবে।

যাহা হোক, শিক্ষকমহাশয়ের কাছে একটা দামী কথা শুনিয়াছিলাম—যদিও নাবিক জীবনের প্রতি ঘোর কটাক্ষ-পাত করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন—"যাহা করিবে তাহা ঠিক করিয়া ফেলা ভালো। কর্ম্মের যদি কোনো স্থিরতা

না থাকে তবে সকল শ্রমই পণ্ড হয়।" আমিও আমার যুবক বন্ধুগণকে বলি, "বন্ধুগণ, চলার জন্য একটা পথ ঠিক করিয়া ফেল এবং সে পথে চলার কালে তোমার মস্তিষ্ক, তোমার হৃদয় এবং তোমার ফুস্‌ফুসের যেন পূর্ণ সম্মতি থাকে।"

আমি ইস্কুলে পড়িব ঠিক করিলাম। এ বিষয়ে আর কোনো দ্বিধা রহিল না। আমি আমার মত ঠিক করিয়াই আমার আত্মীয় ভাই উইলিয়ম ও হেনরীর নিকট ইস্কুলে যাওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব করিলাম। তাহাদের সম্মতি পাইলাম। ইতিমধ্যে একদিন ডাক্তার রবিন্‌সন্‌ আমাদের বাড়ীর নিকটেই চিকিৎসার জন্য আসিতেছেন, শুনিলাম। তিনি আমার মাকে ভালো ভাবেই জানিতেন, সুতরাং নিকটে যাইতেই যথেষ্ট আদর করিয়া বসাইলেন। আমি তাঁহাকে আমার কোনো গোপন বিষয় জানাইবার ইচ্ছা করিলে তিনি ঘরের বাহিরে আসিলেন। ডাক্তার একটা গুঁড়ির উপর বসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি চিকিৎসক, লোকের শরীরের নাড়ী-নক্ষত্র বেশ ভালো ভাবে বুঝিতে পারেন। আমি জানিতে চাই, আমার পড়া শুনা করা উচিত কিনা, পড়া শুনায় কিছু ফল হইবে কি না, সে রকম হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং শক্তি আমার আছে কি না? আপনার মতামতের উপর আমার ইতি কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

তিনি অন্য লোকের নিকট, আমার শরীর পরীক্ষা করিয়া কি বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে বলিবার কোনো দরকার নাই। তবে আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার মন যে পথে যাইতে চাহিতেছে সেই উঁচু পথে ছুটিয়া চল। অতঃপর আমাকে তোমার বন্ধু মনে করিও। যতটা কাজ তোমার করা দরকার, তুমি করিবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে তুমি ভয় পাইও না, তাহা হইলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই জগতে নাম রাখিয়া যাইতে পারিবে।" আমি সেদিন সত্য সত্যই একটা বিরাট শক্তি লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম।

১৩

চেষ্টার আমাদের বাড়ী হইতে মাইল দশেক দূর। সেখানকার বিদ্যালয়টী বেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া, আমি এবং আমার আত্মীয় ভাই উইলিয়ম ও হেনরী, আমরা তিন জনে সেখানে পড়িব স্থির করিলাম। ইস্কুল খুলিবার আগের দিন আমরা বাড়ী হইতে রওনা হইলাম। নিজেরা রান্না করিয়া খাইলে খরচ কম পড়িবে বলিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় বাসন-কোষন, কিছুদিনের মতো ডাল, চা'ল, নুণ, মশলা এবং কিছু মাংস ও বই খাতা ইত্যাদি গাঁটরী বাঁধিয়া পিঠে ফেলিয়া বাড়ী হইতে পায়দলে রওনা হইলাম। সেদিন বেশ একটা আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে কুড়ুল হাতে কাঠুরিয়া বেশে, ছুতারমিস্ত্রীর সাক্‌রেদ রূপে, ক্ষারের কারখানার কর্ম্মচারী রূপে এবং চাষী ও মাল্লা রূপেও বেশ আনন্দ পাইয়াছি। কিন্তু সেদিনের এই আনন্দটা উহাদের চেয়ে অনেক বড় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ছাত্রজীবনের মাধুর্য্য বোধ হয় অন্য সকলের চেয়ে বেশি এবং বিশেষত্ব-পূর্ণ। পুস্তক ঘাড়ে লইয়া দুনিয়াময় ভ্রমণ করিলে বোধ হয় সম্মানটা বাড়িয়াই চলে! অর্থ এবং অন্নবস্ত্র চাহিলে

লোকে ভিক্ষুকই মনে করিয়া থাকে, কিন্তু পুস্তক বা বিদ্যা ভিক্ষা করিলে লোকে অন্যরূপ ভাবিয়া থাকে। আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের, কিন্তু জ্ঞান সকল দেশে একইরূপে স্বীকৃত হয়। মনুষ্যত্বের মাপকাঠি সকল দেশে একই মাপের।

পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের কাহারই ভালো ছিল না—পরিচ্ছদ ছিল না বলিলেই এক কথায় সব চুকিয়া যায়। পাঁৎলুনটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে হাঁটুর নীচে আসিয়া আর অগ্রসর হইবে কি না, আমার মতের অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়, মা সেটাকে নিজে খাটিয়া যতদূর সম্ভব নূতন করিয়া ফেলিলেন। এইভাবে জোড়াতালি দিয়া আমার পরিচ্ছদের অধ্যায়টা শেষ। কারণ ইহার অধিক সুবন্দোবস্ত করার চেষ্টা করা, আর মায়ের প্রাণে ব্যথা দেওয়া আমার কাছে একরূপ বিবেচিত হইয়াছিল। ছাত্র জীবনে কাজ চালাইয়া লইবার বেশি পোষাক থাকা আমি পছন্দ করিনা। ছাত্রের গৌরব পুস্তকে, বিলাসিতায় নহে। এই সময়ে নানা রকম সুখাদ্যের প্রতি লোভ থাকাও উচিত নয়। শুধু শরীর রক্ষার পক্ষে যতটকু পুষ্টিকর খাদ্য দরকার তাহাই গ্রহণ করা উচিত। যে কোনো রকমের বিলাসিতাই হোক, কি খাদ্যে কি পোষাকে ছাত্রের পক্ষে তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য। কারণ ছাত্রকে আশ্রয় করিয়াই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য চরিত্র নানা ভাবে

পুষ্ট হইতে থাকে। চরিত্রের শক্তি অসীম কিন্তু ইহার বৃদ্ধির প্রকৃতি অতি কোমল। যেখানে ইহার বৃদ্ধির পক্ষে বাধা পায় সেখানেই ইহার মৃত্যু ঘটে। কাজেই ইহাকে রক্ষা করিবার গুণ থাকিলে, বিশ্বস্ত ও কর্ম্মক্ষম ভৃতের ন্যায় সকল ক্ষেত্রেই ইহার সাহায্যে জয়ী হওয়া যায়।

যাইবার সময় টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি এবং পয়সা যাহা কিছু ছিল, মা বাহির করিয়া আনিলেন। ইহা আমার জন্যই মা জমাইয়া রাখিয়াছিলেন। গুনিয়া দেখিলাম মোট ৩৪।৵০ আনা রহিয়াছে। সেখানে যাইয়া কাজ আরম্ভ করার পক্ষে এই টাকাই যথেষ্ট, দরকার হইলে অবশিষ্ট টাকা আমি রোজগার করিয়া লইতে পারিব বলিয়া,মাকে নিশ্চিন্ত করিলাম।

চেস্টারে হাজির হইয়া, আমরা বরাবর প্রিন্‌সিপাল মহাশয়ের বাসার দিকে রওনা হইলাম। অভিবাদনের পর আমরা তাঁহাকে বলিলাম, আমরা আপনার ইস্কুলে পড়িতে আসিয়াছি,—আমাদের বাড়ী অরেঞ্জে। তিনি নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা আমাদের নাম বলিলাম। দুই এক কথার পরই অধ্যক্ষ মহাশয় পরিষ্কার ভাবে বলিয়া ফেলিলেন, তাঁহার ইস্কুলে বড় লোকের ছেলেরাই পড়াশুনা করে। দরিদ্র আমরা অন্য কাজে লাগিতে পারিব, এই ভরসাটুকুও দিলেন। বলা বাহুল্য, আমাদের পোষাক পরিচ্ছদেই দারিদ্র্যের ছাপমারা ছিল। কাজেই তাঁহার কথায় আমাদের দুঃখিত হইবার

কোনো কারণ ছিল না। বলিলাম, "মহাশয়, আমরা ধনীর সন্তান নই বলিয়াই আমাদের খাওয়া দাওয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম আমরা লইয়া আসিয়াছি।"

—"বটে!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা নিকটে একটু থাকিবার জায়গার সন্ধান চাই মাত্র।" অধ্যক্ষ বলিলেন, আমাদের অনেক দরিদ্র ছাত্রছাত্রী ছাত্রাবাসে থাকিতে পারে না বলিয়াই নিকটে নিজেদের বাসস্থান খুঁজিয়া লইয়াছে। সে বিষয়ে কোনো অসুবিধা হইবে না বলিয়াই একটু অগ্রসর হইয়া কিছু দূরে একটা পুরাণা বাড়ী—চূণকাম কি আস্তর নাই—দেখাইয়া দিলেন। সেই বাড়ীরই একাংশে আমাদেরই মতো গরীব, বাড়ীর বৃদ্ধা মালিক বাস করিতেন এই খবরটুকুও তিনি আমাদিগকে দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া সেই বাড়ীতে হাজির হইলাম এবং গৃহকর্ত্রী মহিলার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া একখানি ঘর ভাড়া করিয়া ফেলিলাম। সেই ঘরে আমাদের ব্যবহারের জন্য পাইয়াছিলাম, একটা চুল্লী, তিনখানা পুরাতন চেয়ার এবং দুইখানা বিছানা। বিছানা দুইটী শুধু ভাড়ার নিয়ম রক্ষার জন্যই রাখা হইয়াছিল। যাহাহোক, আমরা জিনিষপত্র খুলিয়া আমাদের রাত্রির খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে লাগিয়া গেলাম।

পরদিন ইস্কুল। ইস্কুলের অবস্থা দেখিয়া বেশ ভালো লাগিল। ছেলে মেয়েতে ছাত্র সংখ্যা এক শত। নানা স্থান হইতে ছাত্র ছাত্রী আসিয়াই চেষ্টারের নাম রটাইয়া ফেলিয়াছিল। আমি অধ্যক্ষ মহাশয়ের পরামর্শানুসারে ব্যাকরণ, পদার্থ বিজ্ঞান, পাটীগণিত এবং বীজগণিত এই চারিটীর মিলন বিভাগ পছন্দ করিলাম।

রান্না-বান্নার কাজে যতটা আমোদ পাইবার আশা করিয়াছিলাম শেষ পর্য্যন্ত ততটা পাইলাম না। দিন কতক মন্দ লাগে নাই, কিন্তু তারপর বাধ্য হইয়াই গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধাকে দরমাহার সর্ত্তে কিছু কিছু রান্নাকরার কাজে বহাল করিলাম। বৃদ্ধা ঐ বেতনে আমাদের কাপড় চোপড়ও ধুইয়া দিতেন। অবশ্য এজন্য আমরা বৃদ্ধাকে বেশি কিছুই দিতাম না। বলিতে গেলে, তিনি আমাদের স্নেহের টানেই এতটা করিতেন, বলা উচিত। তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে প্রতি সপ্তাহেই চুকাইয়া দিতাম। পুস্তক খরিদ এবং অন্যান্য আবশ্যক খরচ বাদে দেখিলাম, আর সামান্য কিছু হাতে আছে। আমি জানিতাম, ঐ ৩৪।৶০ আনায় শেষ পর্য্যন্ত আমার চলিবে না। কাজেই আমি চেষ্টারে যাইবার পর হইতেই আমার বাসার অপর দিকে এক ছুতার মিস্ত্রীর কারখানার দিকে প্রায়ই চাহিয়া থাকিতাম, এই আশায়, যদি তাহারা একটা কাজ দিয়া আমাকে সাহায্য করে। দেখিতাম, তাহারা সারা দিনই

কাজে খুব ব্যস্ত থাকে। কোনো কারখানায় যথেষ্ট কাজ কর্ম্ম না থাকিলে সেখানে থাকা আমার পোষায় না। কাজেই যেদিন অর্থের ভাবনা আসিল তারপর দিন ঐ কারখানাতেই রোজগারের পথ দেখিতে হইল।

পরদিন ইস্কুলে যাইবার পূর্ব্বেই আমি সূত্রধর হেমান্ উড্ওয়ার্থ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার আগমনের কারণটা জানাইলাম। সূত্রধর ট্রীট্ মহাশয়ের কথা বোধ হয় আপনাদের মনে আছে। আমি তাঁহার বিশেষ পরিচিত এবং প্রথমে ছাত্রহিসাবে ও পরে তাঁহার অধীনে নানা রকমের কাজ করার বিষয়ে বলিতেই বুঝিলাম, লোকটীর মন একটু টানিয়াছে।

তিনি বলিলেন,—"তোমার পড়াশুনার যাবতীয় খরচ তোমাকেই চালাইতে হয় কি ?"

—"আজ্ঞা হ্যাঁ। ৩৪।৵০ আনা লইয়া বাড়ী হইতে আসিয়াছিলাম, এখন আর সে ভরসাও নাই।"

—"আমার এখানে খাইয়াও বোধ হয় তোমার বিশেষ সুবিধা হইবে না।"

—"আমি নিজে রান্না করিয়া খাই বলাতে, তিনি খুব খুসি হইলেন এবং সেইদিন বৈকালে ইস্কুলের পর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। তাঁহার নিকট কতকটা ভরসা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম বটে, কিন্তু মনটা কেমন যেন হইয়া

গেল। পাছে, তাঁহার গলগ্রহ হইতে হয় সেজন্য বলিলাম, "আপনার যদি আপাততঃ কোনো কাজ না থাকে তবে আমাকে রাখার দরকার নাই। আমিও কাজ করিয়া আরাম পাইব না। আমার যখন হাত পা আছে তখন আপনার আমাকে দান-খয়রাতের প্রয়োজন নাই।"

উড্‌ওয়ার্থ মহাশয় বলিলেন, "ইস্কুল ছুটির পর দেখা করিও তো তখন দেখা যাইবে।"

হিসাব করিয়া দেখিলাম, দৈনিক দুই ঘণ্টা বড়জোর তিন ঘণ্টা এবং শনিবার সারাদিন কাজ করিতে পারিব। চলিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে বলিলাম, "আমার কাজ দেখিয়া পছন্দ হইলে আমাকে যাহা দেওয়া উচিত মনে করেন দিবেন।"

উড্‌ওয়ার্থ মহাশয়ের অনুগ্রহ পাইতে বঞ্চিত হইলাম না। প্রত্যহ সকালে ইস্কুলে যাইবার পূর্ব্বে—খাওয়াদাওয়ার সময়টা হাতে রাখিয়া, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় কাজ করিতাম। বৈকালে চারিটা হইতে আবার কাজে লাগিতাম। শনিবারে সারাদিনই কাজ করিতাম। পুরা এক বৎসর ঠিক এই ভাবে কাজ করিয়াছিলাম। ক্বচিৎ কোনো দিন এক আধ ঘণ্টা আমোদ প্রমোদে কাটাইয়াছি। অন্যান্য ছেলেদের মতো খেলাধূলা করিবার সুযোগ আমার ছিল না। আমার চেয়ে আমোদ-প্রমোদে কোনো ছাত্রই বেশি মজিতে পারিত না,

তথাপি পাওনাদারের টাকার ভাবনায়, চিরদিনের মতো খেলাধূলা পরিত্যাগ করিয়া, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে, অসময়ে আমাকে বুড়া সাজিতে হইয়াছিল। যাহা হোক, বৎসরের শেষে আমার হাতে যথেষ্ট টাকা জমিয়া গেল। সকল দেনা পরিশোধের পর বাড়ী যাইবার সময় আমার হাতে ৮।৯ টাকা মজুদ ছিল।

চেষ্টার বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী আমাকে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল। লাইব্রেরীটি খুবই ছোট ছিল—মাত্র ১৫০ খানা বই উহার সম্পত্তি। কিন্তু সেগুলি মূল্যবান সন্দেহ নাই। সময়াভাবে সেই সামান্য কয়খানা বইই আমার পড়া হইয়া উঠে নাই। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া ইস্কুলের পড়া এবং অন্যান্য কাজ শেষ করিতে হইত। সেই সঙ্গে, যতটা সম্ভব হইত লাইব্রেরীর বইও পড়িতাম। পড়া আমার রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইস্কুলের নিয়মানুযায়ী মাসে দুইবার আমাকে রচনা লিখিতে হইত। ঐ সকল রচনার বিষয় কখনও অধ্যক্ষ মহাশয় বলিয়া দিতেন, আবার কখনো লেখকের পছন্দের উপর নির্ভর করিত। কোনো কোনো দিন লেখককেই সকল ছাত্রের সামনে দাঁড়াইয়া রচনা পড়িতে হইত। আমি প্রথম যেদিন আমার রচনা পাঠ করি, সেইদিন আমার পা দুইটী যে ভাবে কাঁপিয়াছিল, ১২।১৪ বৎসর পর বিদ্রোহীদের

কামানের গোলার সাম্‌নে দাঁড়াইয়াও বোধ করি ততটা কাঁপে নাই। ভাগ্য ভালো, আমার পায়ের সাম্‌নে একটা পর্দ্দা ছিল, তাই কেহ আমার এই অবস্থা দেখিতে পায় নাই। জীবনে আর কোনো দিন এভাবে বোধ হয় আমার পা কাঁপে নাই। আমার এই অবস্থা শুনিয়া উইলিয়ম বলিয়াছিল, সে যদি এই রকম একটা প্রবন্ধ লিখিতে পারিত, তাহা হইলে আরো বেশি পা-কাঁপাইতে সে ক্রুটী করিত না। শ্রোতারা নাকি আমার লেখার প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তখন জীবন-মরণ সমস্যা। প্রশংসার কথাটা উল্লেখ করার একটু দরকার মনে করিতেছি। শ্রোতাদের ভিতর কেহ কেহ নাকি বলিয়াছিলেন, আমার এই ছেঁড়া পোষাকের ভিতর হইতে এই রকম একটা রচনা বাহির হইল কি করিয়া! ইহাতে তাহাদের খুবই আশ্চর্য্য হইবার কথা। কারণ তাহাদের যুক্তিতে এইরূপ দাঁড়ায় যে, পোষাক পরিচ্ছদ ভালো হইলে লেখাপড়া ভালো হইবে, আর পোষাক ছেঁড়া হইলে বিদ্যাও ছেঁড়া হইবে। আমি মনে করি, পোষাকের সঙ্গে লেখাপড়ার কোনই সম্বন্ধ নাই। সাধারণতঃ ধনীরা বিদ্যাকে ভোগ-বিলাসের উপরে স্থান দিতে পারেন না। পোষাকের বাহার তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলে বলিয়াই, দীন-হীনেরা বিদ্যার সেবক হইয়া জগতে বরণীয় হইয়া থাকেন। এই কারণেই ইতিপূর্ব্বে

ছাত্রজীবনের ভোগ-বিলাসের বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া আসিয়াছি।

ইস্কুলে আলোচনা সভাও ছিল। আমি আলোচনায় বেশ আনন্দ পাইতাম। এইখানেই সর্ব্বপ্রথম আমি এই বস্তুর সহিত পরিচিত হই। ইহার দ্বারা জ্ঞানের পরিসর হয় বলিয়া প্রিন্‌সিপাল আমাকে ইহাতে যোগ দিতে বলিয়াছিলেন। প্রথমে আমার শক্তি সম্বন্ধে মনে একটা সন্দেহ জন্মিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই আমি যথেষ্ট উপকারিতা বোধ করিতে পারিলাম। এই আলোচনা সভায় আমি যাহা লাভ করিয়াছিলাম, পরবর্ত্তীকালে তাহারই সাহায্যে আমি রাজনীতিক্ষেত্রে নির্ভয়ে চলা ফেরা করিতে সাহস পাইয়াছি। শুধু এই জন্যই, বাধ্য হইয়া আমাকে লাইব্রেরীর অনেক বই পড়িতে হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে যাহারা আমার প্রবন্ধের সঙ্গে পোষাকের গরমিল দেখিয়া মহা সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, আলোচনায় যোগ দেওয়ার পর হইতে সেই তাহারাই স্বেচ্ছায় আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।

আমি এই প্রসঙ্গে দুই চারিজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম করিতেছি। ইহাতে আপনারা জীবনের অগ্রগতিতে যথেষ্ট ভরসা পাইবেন। বিখ্যাত লোকহিতৈষী বাক্‌স্টন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ক্যানিং এবং আরো অনেকে আলোচনা

সভার আমলে আসিয়াই এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, যাহারা আলোচনা-সভা অথবা অন্য কোনো সভা-সমিতি হইতে দূরে দূরে থাকেন, তাহাদিগকে পাকড়াও করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে জগৎ আরও বেশি লাভবান হইত সন্দেহ নাই। অনেক সুপ্ত প্রতিভা লোক লজ্জার ভয়েই দূরে দূরে থাকিয়া চিরদিনের মতো লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১৪

দুই মাস গরমের ছুটী পাইয়া বাড়ী আসিলাম। বাড়ীর কাজকর্ম্ম দেখার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া গেল। আমার দাদা মা'র জন্য একটা ধানের গোলা তৈরী করিতে চাহিলেন। সরঞ্জাম সবই তৈরী ছিল কেবল আমার অপেক্ষা। আমিও এতদিন নানা লোকের মজুরী করিয়াছি, এবারে নিজ দায়িত্বে কাজ করার সুযোগ পাইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। আমরা দুই ভাইয়েই গোলাটা তৈরী করিয়া ফেলিলাম; জিনিষটা ভালোই হইয়াছিল। ঘর দুয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া গোলা পর্য্যন্ত তৈরী হইয়া গেল। একজন গৃহস্থের পক্ষে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় এই সময়ে তাহার কিছুরই আমাদের অভাব ছিল না। সাধারণভাবে জঙ্গলেরও তখন আর সেদিন ছিল না। লোকসংখ্যা বাড়িতেছিল এবং চাষবাসের দ্বারা তাহাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যথেষ্ট।

ডাক্তারের বিল পরিশোধ এবং নিজের কাপড় চোপড় ও অন্যান্য জিনিষপত্র খরিদ করিবার জন্য টাকার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। কাজেই গোলা তৈরী হওয়ার পরই আমি

একজন গৃহস্থের ফসল কাটার কাজে লাগিয়া গেলাম। চেষ্টারে ফিরিবার পূর্ব্বেই এই টাকা আমার সংগ্রহ করা দরকার। খেলাধূলা একদম ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত ছুটিটা দিবা রাত্র পরিশ্রমের ফলে ডাক্তারের টাকা পরিশোধ করিয়া ফেলিলাম। প্রথম বারে চেষ্টারে যত টাকা লইয়া গিয়াছিলাম, এবারের জন্য তাহার চেয়ে অনেক বেশি জমা হইয়া গেল। মা'র হাতেও যাহাতে কিছু থাকে তাহারও ব্যবস্থা করিলাম।

বাড়ী আসিবার সময় চেষ্টার বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী হইতে খান দুই তিন বই লইয়া আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর শুধু ঐ সকল বইই পড়িতাম। এই ভাবে আমার ছুটিটা কাটিয়া গেল। আমি আবার চেষ্টারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এবারে সঙ্গে লইলাম মাত্র এক আধুলি। আমার ভরসা ছিল, উড্ওয়ার্থ মহাশয়ের কারখানায় কাজ যখন জুটিবেই, তখন আর ঘরের পয়সা বাহিরে বহিয়া লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি!

চেষ্টারে ফিরিবার পর প্রথম রবিবার গির্জ্জায় উপস্থিত হইলাম। উপাসনার শেষে সাহায্যের বাক্স সকলের সাম্নে সাম্নে ফিরিতেছিল। আমি আর কি করি! আধুলিটাই বাক্সে ফেলিয়া দিয়া সকল ভাবনার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। আপনাদের ভিতর যদি কেহ কখনো এরূপ কাণ্ড

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই বুঝিতে পারিবেন এরূপ নিঃসম্বল হওয়ায় কি আরাম। ম্যাসাচুসেট্সের হোরেস্মান্ খুবই গরীব ছিলেন। কিন্তু শিক্ষালাভের আগ্রহ ছিল তাঁহার অত্যন্ত প্রবল। এক সময়ে তাঁহার হাতের পয়সা যখন কমিয়া আসিতেছিল, তখন তিনি ভবিষ্যতের ভাবনায় তাঁহার ভগ্নীকে লিখিয়াছিলেন, "দিন কতক হইল আমার দুইটী আধুলির ভিতর একটী অপরটীকে জন্মের মতো ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

ইস্কুল-লাইব্রেরীর যে সকল বই আমি পড়িয়াছিলাম, তাহার ভিতর একখানি ছিল "রাইটের" জীবনী। তাঁহার ছাত্র জীবন শুধু দুগ্ধপানের দ্বারাই অতিবাহিত হইয়াছিল। আমি তখন বিশ্বাস করিতাম, এবং এখনো বিশ্বাস করি যে, দুগ্ধ বা ফল-আহারে ছাত্র জীবন যেমন মধুর এবং পবিত্র ভাবে অতিবাহিত হয়, মাংসাদি আহার করিলে সেরূপ হয় না। উত্তেজক খাদ্য জ্ঞানযোগীর পক্ষে সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। হিসাব করিয়া দেখা গেল দুগ্ধপানে আমাদের খরচ অনেক কম পড়ে। মাংসাদি ছাড়িয়া দুধের উপরই নির্ভর করিলাম। একমাস পর হিসাব করিয়া দেখিলাম, জনপ্রতি ৩৸৵০ আনা পড়িয়াছে। উইলিয়ম ও হেন্‌রীও আমারই মতো দুধ খাইয়া দিন কাটাইতেছিল। তাহারা খরচটা আরো কিছু বাড়াইতে চাহিল। আমি আপত্তি

করিয়াছিলাম—কিন্তু ভোটে হারিয়া গেলাম। তাহারা জয়লাভ করিয়া জনপ্রতি মাসিক ৬।০ আনার বাজেট করিল।

আমি ভালোমন্দ বা কমবেশি খাদ্যের কোনো দিন কোনো প্রকার ধার ধারি না। সকল প্রকার অবস্থার উপরই মানুষকে জয়ী হইতে হইবে,—ইহাই আমার চিরদিনের নীতি।

"গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ।
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস॥"
এবং "হউক সুরন্ধিত কিংবা কুৎসিত।
ভুঞ্জহ সকলি হ'য়ে অবিকৃত॥"

আমি শয়ন-ভোজন সম্বন্ধে এই দুই নীতি চিরদিন মানিয়া চলিয়াছি। ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব না ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষের প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি আসিতে পারে না। ইহাতেও আমার স্বাস্থ্য অটুট ছিল। খাটিতে পারিতাম, যথেষ্ট, কষ্ট সহিবার ক্ষমতাও ছিল অসম্ভব। কাজেই কোনো অবস্থাই আমাকে কোনোদিন কাবু করিতে পারে নাই। প্রথম বৎসরের শেষ ভাগটা আমরা মাসিক ৬।০ আনায় অথবা তাহার কিছু বেশিতেই চালাইতে পারিয়াছিলাম। আমার মনে হয়, কতকগুলি খাওয়াটা কিছু নয়। যে অবস্থায় যতটা খাইলে স্বাস্থ্য বজায় থাকে সেই সময় ততটুকুই খাওয়া ভালো।

আমি আমার শিক্ষকতা করা সম্বন্ধে প্রিন্‌সিপাল মহাশয়ের নিকট কখনো কোনো কথাই উত্থাপন করি নাই।

শেষ বৎসরের মাঝামাঝি সময় তিনি নিজেই কথাটা উত্থাপন করিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় আমার দরিদ্র জীবনের সকল কথা ভালো রূপেই জানিতেন। সেই কারণেই আমার সম্বন্ধে এতটা যত্ন লইয়াছিলেন। বেশ ভালোরূপে যাহাতে আমার শিক্ষালাভ হয়, ইহাও তাঁহার আন্তরিক কামনা ছিল। কাজেই বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে এই শিক্ষকতা ব্যতীত তিনি অন্য কোনো পন্থাই আর খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহাকে বলিলাম, "মা'র প্রবল ইচ্ছা যে, আগামী শীতকালেই আমি শিক্ষকতা আরম্ভ করি। তাঁহার বহুদিনের এই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যই আমি শিক্ষালাভ করিতেছি।" অধ্যক্ষ বলিলেন, "খুব খুসী হইলাম যে, তুমি তোমার মায়ের বাধ্য। যাহারা মা'র বাধ্য, তাহারা জীবনে কখনো ভুল পথে চলে না।" এই কথার পর আমার জন্য আমার চেয়ে তাঁহারই যেন ভাবনা হইল বেশি। তিনি বলিতে লাগিলেন, "শিক্ষকতা দ্বারা যে শুধু তোমার আর্থিক লাভই হইবে তাহাই নয়, তুমি অন্যকে মানুষ করিয়াও তুলিতে পারিবে। শুধু পয়সার দিকটা না দেখিয়া অন্য দিকেও সকল শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত। মনে রাখিও, আমরা শুধু নিজের নিজের সুখ ভোগের জন্যই এই সংসারে বাঁচিয়া নাই এবং সে জন্য কাহারো বাঁচিয়া থাকা উচিতও নহে।"

"আমি কি কোথাও চাকুরী পাইব মনে করেন?" এই

কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, "দশ বৎসর পূর্ব্বে যত শিক্ষক ছিল এখন তার দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, ইস্কুলের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। বিশেষতঃ তোমার পক্ষে চাকুরী পাওয়া কষ্ট হইবে না এবং শিক্ষকতা করিয়া তুমি কৃতী শিক্ষকদের মধ্যেই স্থান পাইবে।" কি কারণে আপনি আমার সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করেন?

অধ্যক্ষ বলিলেন, "মনের ভাব যখন তখন পরিষ্কার করিয়া বলিবার ক্ষমতা শিক্ষকের একটা বড় গুণ; কোনো বিষয় নানাভাবে বিচার করিবার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন; ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকেরা বন্ধু ভাবে থাকিবেন এবং যাহাতে ছাত্র শিক্ষককে নিতান্ত আপনার জন মনে করিয়া সকল সময়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ পাইতে পারে শিক্ষকের চরিত্র এরূপ হওয়া আবশ্যক। যে শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের বাঘ ভেড়া সম্পর্ক সেই শিক্ষক যত বড় পণ্ডিতই হউন, তিনি ছাত্রের চরিত্রগঠনের কর্ত্তা এবং প্রকৃত অভিভাবক হইতে পারেন না। মানুষ গড়িয়া তুলিয়া জাতির শক্তি বাড়াইবার ক্ষমতা ইহাদের থাকে না।"

আমার কোনো যুবক বন্ধু শিক্ষকতায় ব্রতী হইলে এই প্রবীণ শিক্ষকের উপদেশ গুলি তাহার পক্ষে কার্য্যকরী হইবে বিবেচনা করিয়া বহুদিনের পুরাতন কথাগুলি আবার নূতন করিয়া এখানে বসাইয়া দিলাম।

গারফীল্ড

গরমের ছুটীতে বাড়ী আসিলাম। শীতের সময় শিক্ষকতা করিবার জন্য পর দিন হইতেই ইস্কুলের খোঁজে বাহির হইলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, সহজে কোথাও চাকরী পাওয়া যাইবে না। শেষ পর্য্যন্ত ঘটিলও তাই।

যে দিকে গেলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা, সেই দিকে রওনা হইলাম। বাড়ী হইতে মাইল দশেক দূরে একটা ইস্কুলে যাইয়া কর্ত্তৃপক্ষকে আমার উদ্দেশ্য জানাইলাম। ইস্কুল-কমিটি জবাব দিলেন "তোমাকে বড্ড ছেলে মানুষ দেখাচ্ছে হে। আমাদের ইস্কুলে পড়াবার জন্যে ছোক্‌রা মাষ্টার হ'লে চল্‌বে না, জানলে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বুঝতে পেরেচি। তবে আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে চেষ্টার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রাঞ্চের প্রশংসা পত্র আছে।" আমি প্রশংসা পত্র দেখাইতে যাইব, এমন সময় জনৈক কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, "সে সম্বন্ধে তো কোনো কথা উঠছেনা। তুমি যে বেশ জ্ঞানী আমরা তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু তোমার বয়েসটা তো আর বাড়াতে পারছ না; মুস্কিল হয়েছে সেই খানটায়। আমাদের ইস্কুলে বেশি বয়সের কম বয়সের নানা রকমের বিস্তর ছাত্র পড়ে কিনা!" বুঝিলাম, ইহাদের ইস্কুলে গোঁফ-দাঁড়ির মূল্য আছে, এবং গোঁফ-দাঁড়ির দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের উপরই পাণ্ডিত্যের এবং সম্মানের পরিমাণ স্থির হয়। আজ অবশ্য আমি এরকম আর ভাবিনা

কিন্তু সেই দিন সেই সময়ে ঠিক এই রকমই আমার মনে হইয়াছিল। আমার শিক্ষক জীবনের প্রথম উদ্যম ইহাদের একটা খামখেয়ালীতে নষ্ট হইয়া যাইবার মতো হইল দেখিয়া আমি মনে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলাম।

আমি স্থান ত্যাগ করিয়া পথ চলিতে চলিতে শিক্ষকের যোগ্যতার সঙ্গে বয়সের সামঞ্জস্যটা কোথায় তাহাই অনবরত চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে আর একটা ইস্কুলে হাজির হইয়া আমার উদ্দেশ্য জানাইলাম। জবাব পাইলাম "যদি আর সপ্তাহখানেক আগে আসিতেন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে রাখিতে পারিতাম।" আবার অন্তরে আশার ক্ষীণ আলোক জ্বলিয়া উঠিল। বুঝিলাম, এখানে অধিক বয়সের চেয়ে যৌবনেরই সম্মান বেশি। এই ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে আর একটা ইস্কুলের খবর দিয়া যথেস্ট অনুগ্রহ দেখাইলেন। তাঁহার কথা মতো সেখানে যাইয়া দেখা করিলাম। ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ নেল্‌সন্‌ বলিলেন, "আমরা এইমাত্র একজন যুবক শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছি। তাঁহাকে বিদায় দিয়া আর একজন শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত নয়।" আমি বলিলাম, "ঠিক কথা, যাঁহাকে রাখিয়াছেন তিনি কি রকম কাজ করেন তা দেখা দরকার। আমি হইলেও ঠিক এই রকমই করিতাম।"

প্রশ্ন হইল,

—"আপনি কোন্ ইস্কুলের ছাত্র ?"

—"আমি চেষ্টার বিদ্যালয়ের ছাত্র।"

—"আহা! মহাশয়, দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এখানে চেষ্টারের এক ছাত্র শিক্ষকতা করিতেন। কি বলিব! এ পর্য্যন্ত তার মতো উপযুক্ত শিক্ষক আমরা আর একজনও পাই নাই।"

—"মহাশয় আমি বড়ই খুসি হইলাম। তিনি যদি তাঁহার কাজে যোগ্যতা দেখাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে আপনারা সেখানকার আর কোন ছাত্রকেই এখানে নিশ্চয়ই সুযোগ দিতেন না"—"ঠিকই বলিয়াছেন।"

তখন প্রায় সন্ধ্যা। বাড়ী ফিরিব ভাবিতেছি এমন সময়ে মিষ্টার নেল্‌সন্ বলিলেন, "এখন আর কোথায় যাবেন, আজ রাত্তিরে এখানে থাকুন, আলাপ পরিচয় করা যাবে।"

সে রাত্রি সেখানে বেশ আদর যত্নে কাটাইয়া পরদিন ভোরে আবার শিক্ষকতার জন্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইলাম। এক ইস্কুলের এক কমিটি-মেম্বার বলিলেন, "না মশায়, চেষ্টার-ইস্কুলের কোনো ছাত্রকে আর আমরা শিক্ষকরূপে রাখিতে চাহি না। একজনকে রাখিয়াছিলাম।"

দুই দিন প্রাণপাত পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরিলাম। কোনোই সুফল দেখা গেল না। মনটা বেশ দমিয়া গেল।

মা বলিলেন, "জেমস্‌ ইহার ভিতর ভগবানের নিশ্চয়ই কোনো মঙ্গল ইচ্ছা রহিয়াছে। এত অসুবিধা, বিপদ আপদ পার হইয়া এখন তোমার এভাবে দমিয়া যাওয়া ঠিক নয়।" মা'র ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস চিরদিনই দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে মুখে কিছু বলিলাম না বটে, তবে এত দুঃখের ভিতরও মনে মনে না হাসিয়া পারিলাম না।

পরদিন ভোরে তখনো ঘুম হইতে উঠি নাই। উঠিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই উঠি নাই। এমন সময়ে একজন লোক দরজায় দাঁড়াইয়া আমার মাকে ডাকিতেছিল। তাহার ডাকার উদ্দেশ্য আমার খোঁজ লওয়া। আমি তাঁহাদের ইস্কুলে পড়াইতে রাজি আছি কি না, মাকে জিজ্ঞাসা করিল। "ইস্কুল" কথাটা কানে যাইতেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমি লাফাইয়া উঠিয়া, মা'র ভগবানের কথা মনে করিয়া লোকটাকে দেবদূত ঠাওরাইলাম। ওঃ হরি! এই দেবদূত! কিছুকালের জন্য আমার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। লোকটীকে আমি ভালোরূপেই জানিতাম। একরকম আমাদের প্রতিবেশীই বটে এবং যে ইস্কুলের জন্য সে আমাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল তাহাও আমার অপরিচিত ছিল না। আমার জানা ছিল, সেই ইস্কুলের ছেলেগুলি যেমন অশিক্ষিত, তেমনি বর্ব্বর। কাজেই হাতের কাছে চাকুরীটা পাইয়াও ইতস্ততঃ

করিতে লাগিলাম। লোকটীও বলিল, "জেমস্ যত রাজ্যের জানোয়ার যে ওখানেই জমায়েৎ হইয়াছে তাহা তুমিও জানো।" একটা কথা না বলিলে নয় তাই বলিলাম "তাতো জানি হে, সেখানে পড়ানো ব্যাপারটা যে একটা গুরুতর কাণ্ড তাও বেশ বুঝি। কিন্তু আমি কি কাজ চালাইতে পারিব? তোমার কি মনে হয়?" একে তো ছেলেগুলি বদমায়েসের জাসু, তাতে আবার ওরা আমাকে চেনে।" এতগুলি ভাবনার কথা শুনিয়া আপনারা আমার অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। এই সঙ্গে আর একটা নূতন খবর পাইলাম। লোকটী বলিল ঐ ইস্কুলের ছেলেরাই নাকি নিজেদের ক্ষমতায় দুইবারে দুইজন শিক্ষককে ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছিল। আমার ভরসা যেটুকু ছিল, এই সুসংবাদ শ্রবণে তাহাও উরিয়া গেল। কিন্তু লোকটা বেশ বলিতে পারে দেখিলাম। সে বলিতে লাগিল জেমস্ "একমাত্র তুমিই ইহাদিগকে বাগ মানাইতে পারিবে। ইস্কুলটাকে ভালোয় ভালোয় চালাইবার ক্ষমতা একমাত্র তোমারই আছে। তবে শিক্ষক যে-ই হোক তাহাকে বেত চালাইতে হইবে। মাঝে মাঝে দুই চারিটা বেতের বাড়ি শপাশপ পিঠে পড়িলে ইহাদের যথেষ্ট উপকার হইবে আর শিক্ষকেরও কাজের সুবিধা হইবে। আর পাঠশালায় গিয়া শিক্ষকের হাতের বেত না খাইলে কি লেখাপড়া হয়!

তুমি যত ইচ্ছা বেত লাগাইও উহাতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই।" খানিকক্ষণ অবাক্‌ হইয়া অনেকগুলি ভালো ভালো কথা শুনিলাম এবং শিখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, খাওয়া থাকা বাবদ মাসে আমাকে তাহারা কত দিবে? "৩৭॥৹ টাকা," বলিয়াই, "কেমন রাজি আছ তো?" একেবারে মত চাহিয়া বসিল। দেখিলাম সাংসারিক লোকের মতো মতলব হাসিলের ব্যাপারে আমি তখনো দুগ্ধপোষ্য শিশু। যেন তাহার ভাবিতে দিবার ফুরসৎটুকুও নাই।

আমি তখনো নির্ব্বাক। মা'র কাছে এই চাক্‌রী বিধাতার দানের সামিল। তাই লোকটীকে বলিলেন "ওকে ভাবিতে সময় দাও।" আমিও সেই কথাটাই সমীচীন মনে করিলাম। টাকার জন্য আমার চাক্‌রীর গরজতো ছিলই, বুঝিলাম, আমাকে পাওয়ার জন্য ওদের গরজও নেহাৎ কম নয়। যাইবার সময় লোকটী বলিয়া গেল, "জেমস্‌ আশা করি তুমি আমাকে পথে বসাইবে না।"

লোকটী চলিয়া গেলে আমি হাত মুখ ধুইয়া খাবার খাইয়া আমাদের আত্মীয় এবং বিপদের দিনের পরম বন্ধু মেসো বইনৃটন্‌ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া সমুদয় ব্যাপার জানাইলাম। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজটা লইতে বলিলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, যদি এই ইস্কুলটাকে সায়েস্তা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমার খ্যাতি

সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িবে এবং ফলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট সুবিধাই হইবে।

যথা সময়ে সেই ব্যক্তিকে খবর দিলাম। দুই দিনের মধ্যে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, জেমস্ গারফীল্ড্ শীতের ইস্কুলে মাষ্টারী করিবেন। বাপ-মা, ছেলে বুড়া, ছাত্রছাত্রী, মেয়ে পুরুষ সকলেই এবিষয়ে মতামত দিতে লাগিল। আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাহাদের সর্ব্ববাদী সম্মত মত জানিয়া আমি অন্তরে কতকটা বল পাইয়াছিলাম।

কিন্তু লোকটীকে কথা দেওয়ার পর ভাবিয়া দেখিলাম, কাজটা মোটেই ভালো হয় নাই। আগে যতটা সাহস পাইয়াছিলাম, পরে দেখিলাম ইহার চতুর্গুণ ভয় আসিয়া আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। মনে আছে, কাজে যেদিন যোগদান করি, সেইদিন ভোরের ইস্কুলে যাইবার সময় মাকে বলিয়া গিয়াছিলাম, খুব সম্ভব ছেলেদের অত্যাচারে দুপুরের পূর্ব্বে আমাকে একেবারেই বাড়ী চলিয়া আসিতে হইবে। মা আশীর্ব্বাদ করিলেন, “তুমি কৃতকার্য্য হইবে এবং শহরের ভিতর সকলের প্রিয় হইবে।” আমি ইহাতে বেশি ভরসা পাইলাম না। কারণ সকল মা-ই তাঁহাদের ছেলের মঙ্গল কামনা করেন তা পুত্রদের যোগ্যতা থাক্ আর নাই থাক্।

যাহাহোক এইবার এই দুঃসাহসিক কার্য্যে আমি কি ভাবে

অগ্রসর হইলাম তাহার বিবরণটা শুনুন। আমি মনে মনে স্থির করিলাম, যথাসম্ভব বেত্র-ব্যবহার করিব না। আমার পরিচালন পদ্ধতিকে সদ্ভাবে ও সুবিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া শক্তিশালী করিব। কাজেই আমি কোনো কঠোর নিয়ম প্রণালী কায়েম না করিয়া প্রথম দিন প্রভাতেই সহানুভূতির সহিত ছাত্রদিগকে বলিলাম, যাহাতে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখিয়া মানুষের মতো হইতে পার তাহার জন্যই আমি আসিয়াছি। যাহাতে তোমাদের এই পাঠশালা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হইতে পারে তাহার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু ইহা বিশেষভাবে নির্ভর করে শিক্ষক এবং ছাত্রের সহযোগিতার উপর। দেখিলাম, আমার কথাটা তাহারা উড়াইয়া দিল না। তাহাদেরও যে একটা মূল্য আছে এবং তাহার দ্বারাই যে এতবড় একটা মহান্‌ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, ইহা যেন তাহারা সেই দিনই প্রথম শুনিল। ঐ সকল দুর্দ্দান্ত ছেলেরা আমার কাছে মাথা নত করিতে ইতস্ততঃ তো করিলই না। বরং ঐ কথাকয়টাকে আনন্দের সহিত হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া তাহারা ইস্কুলের নিয়ম লঙ্ঘন কি আমার আদেশ অমান্য করিবার জন্য কখনো কোনো ইচ্ছাই প্রকাশ করে নাই। তাহারা পড়াশুনায় এমন মন দিল যে, কেহ দেখিলে হয়ত মনে করিতে পারিত, ইস্কুল কি বস্তু তাহা ইহারা এই প্রথম

বুঝিতে পারিয়াছে। আমি শিক্ষাদানের নব নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেখিলাম ছাত্রগণ উহাতে বেশ আনন্দ পাইতেছে। তাহারা—বিশেষভাবে বয়স্ক ছাত্ররা—বুঝিল যে, শিক্ষক ছাগল-ভেড়ার রাখাল বাদে আর কিছু। আমি দুপুরে ছাত্রদের সহিত গল্পগুজবে এবং খেলাধূলায় যোগ দিতাম। ইহার ফলে তাহারা একটা নূতন শিক্ষা পাইল—শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ দেখিয়া। শিক্ষক-ছাত্রে যে বন্ধুভাব হইতে পারে তাহা ইহারা এই প্রথম দেখিল। আমার মনে হয়, এইটাই শিক্ষকের পক্ষে সব চেয়ে বড় কাজ। ছাত্ররা যতক্ষণ শিক্ষককে তাহাদের চালক, অভিভাবক এবং বন্ধু মনে করিতে না পারিতেছে ততক্ষণ শিক্ষকের জীবন পূর্ণ নহে বলিতে চাই। ছাত্রদের সঙ্গে আমার মেলামেশার ফলে অজ্ঞাতসারে ইহাদের যে উপকার সাধিত হইতেছিল তাহা ইহারা বুঝিতে পারে নাই। সেটা আর কিছুই নহে, আমার সাম্‌নে ইহারা কোনো প্রকার ইতরামি অথবা কথায় কথায় খারাপ কথা উচ্চারণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল।

আমি এইরূপে চলিয়া দুর্দ্দান্ত এবং দুর্বিনীত ছাত্রদের ভক্তি এবং ভালোবাসা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলাম। ইহার চেয়ে গৌরব শিক্ষকের জীবনে আর কি আসিতে পারে! আমি নিঃসংশয়রূপে বলিতে পারি, ইহার চেয়ে গৌরবময় জীবন আমার জীবনে আর কখনো আসিয়াছে কিনা জানিনা।

কি ভাবে একটা দুঃশীল এবং দুরন্ত ছাত্রদলকে শান্তির সহিত পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং সেই সকল ছাত্রকে সভ্য শিক্ষিত মানব সমাজের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলাম, আমার যুবক বন্ধুদের সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্যই এতটা বলিয়া গেলাম।

শিক্ষকেরা যে ছাত্রদের পরিবারে পরিবারে আহার করিতেন তাহা আপনারা জানেন। আমাকেও সেই প্রথা অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। এই ভাবে থাকার সময় ইস্কুলে পড়ানো ব্যতীত বাড়ীতেও ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতাম। নানাভাবে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। ইহাতে আমার যথেষ্ট খাটুনি বাড়িল সত্য, কিন্তু সর্ব্বত্র একটা মরা দেহে যেন জীবন ফিরিয়া আসিয়াছিল। এইভাবে ছাত্র এবং ছাত্রের অভিভাবকের হৃদয়ে প্রকৃত শিক্ষকের আসন গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। আমি যখন বিদ্যালয় ত্যাগ করি, ছাত্রও তাহাদের অভিভাবকগণ তখন আমাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহা এখানে উল্লেখ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। তবে সেখানে আমি যাহা কিছু লাভ করিয়াছিলাম তাহা আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বইন্‌টন্‌ মহাশয়েরই প্রাপ্য।

শীতের শেষে চেষ্টারে ফিরিয়া খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম উড্‌ওয়ার্থ মহাশয়ের বাড়ীতে। এজন্য তাঁহাকে

সপ্তাহে আমার ৩।/০ আনা দিতে হইত। কারখানায় আমার প্রধান কাজ ছিল রেঁদা করা। বাড়ী হইতে যাইয়া প্রথম শনিবারে আমি একান্নখানা তক্তা রেঁদা করিয়া প্রতি তক্তা এক আনা হিসাবে—তিন টাকা তিন আনা উপার্জ্জন করিয়া ফেলিলাম। আমার খাই-খরচ একদিনেই সংগ্রহ হইয়া গেল।

পরবর্ত্তী শীতের সময় আবার শিক্ষকতা আরম্ভ করিলাম। এবারে কর্ম্মক্ষেত্র হইল হ্বারেন্স্‌ভিলার এক ইস্কুল। মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা এবং খাওয়া থাকা। পূর্ব্বের ইস্কুলের চেয়ে ইহা সকল দিক দিয়াই বড়। এখানে একদিন একটা ব্যাপার ঘটিল। উপর শ্রেণীর একটী ছাত্র আমার কাছে জ্যামিতি পড়িতে আসে। জ্যামিতি আমি কখনো পড়ি নাই। ভাবিলাম, এইখানেই বুঝি পণ্ডিতের পণ্ডিতী ফাঁক হয়! ছাত্রের নিকট রাজি হইয়া একখানা জ্যামিতি কিনিয়া ফেলিলাম এবং গভীর রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে আমি জ্যামিতি পড়িতাম। আমার নিকট জ্যামিতি পড়িয়া ছাত্রের ধারণা হইয়াছিল, জ্যামিতি শাস্ত্রে আমি বিশেষ পণ্ডিত। আমার যুবক বন্ধুদিগকে আমি বহুবার বলিয়াছি "নিজের শক্তির কথা কখনো কাহারো নিকট প্রকাশ করা উচিত নয় এবং যত বড় কাজই সাম্‌নে আসুক না কেন, তাহার চেয়ে বেশি শক্তিমান একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।" শুধু

এই নীতি অনুসরণ করিয়াই আমি ছাত্রের কাছে মান বজায় রাখিতে পারিয়াছিলাম। অপরের নিকট অপদস্থ হওয়াটা আমি আদৌ পছন্দ করিনা। এজন্য আমি সর্ব্বদাই সজাগ ছিলাম।

এই সময়ে পালাক্রমে একবার আমাকে শ্রীমতী ষ্টিলেসের গৃহে থাকিতে হয়। তিনি যেমন অফুরন্ত করুণাময়ী তেমনি প্রখর বুদ্ধিমতী। আমার পোষাক-পরিচ্ছদ তখনো "একমেবা দ্বিতীয়ম।" এক দিন বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিবার সময় আমার পাঁৎলুনটা বেশ বড় হইয়া ছিঁড়িয়া যায়। তখন যে আমার কি অবস্থা হইয়াছিল, তা' আমার মতো অবস্থা কাহারো হইয়া থাকিলে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তিনি এই পাঁৎলুনটা মেরামত করিবার উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "তুমি যখন প্রেসিডেণ্ট হইবে তখন তোমার এসব আর মনেও থাকিবে না।" আমি প্রেসিডেণ্ট হওয়ার জন্য লালায়িত ছিলাম না, কিন্তু আজিও তাঁহার স্নেহ আমার কাছে লোভনীয় হইয়া রহিয়াছে। আমার মাতৃরূপা ষ্টিলেসের মুখ হইতে যে কথা বাহির হইয়াছিল, তাহা যে এতই অব্যর্থ তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই। আমার মাও বোধ হয় কোনোদিন এত বড় ধারণা মনে আনিতে পারেন নাই।

যাহা হোক্‌, সেদিনে তাঁহার মেরামতিটা যে কত সুন্দর হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিব না। আমার চেষ্টারে আসিবার

সময় ছেঁড়া পাঁৎলুনটাকে যে যত্নে মা ব্যবহারের যোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন সেইদিন শ্রীমতী ষ্টিলেসও ঠিক ততখানি যত্নেই আমার মান বজায় রাখিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত ইহাদের করুণা কীর্ত্তন করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এইবারে আমার চেষ্টার বিদ্যালয়ের শেষ বৎসর। নানা রকমের খাটুনি খাটিয়া এতদিন এক রকমে কাটানো গেল। এখান হইতে বাহির হইয়া কলেজে যাইবার আকাঙ্ক্ষাটাও ছিল প্রবল অথচ খরচের ভাবনাও নিতান্ত কম ছিল না। এই সময়ে নিউ ইংল্যাণ্ডের কোনো কলেজের এক গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁহার কাছে সেখানকার কলেজের সকল খবর পাইলাম। টাকার কথাটাই সবচেয়ে বড়। কাজেই, আলাপটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার ঐখানে আসিয়াই হাজির হইতেছিল। ছাত্রটীর নিকট খবর পাইলাম নিউ ইংল্যাণ্ড ষ্টেটের সকল কলেজেই দেশীয় দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার আছে। তারপর শীতের ইস্কুলে পড়াইবার জন্য কলেজের ছাত্রদের ডাকই আসে বেশি। গ্রীষ্মকালে বাগানে মালীর কাজ করিয়া, লোকের ছেলে পড়াইয়া, ইস্কুলের জন্য শারীরিক কাজ করিয়া এবং ছুতার মিস্ত্রীর শাকরেদ্ হইয়া অনেক ছেলেই নিজের নিজের উপায় করিয়া লয়। এই সব আলাপের ভিতর হইতে আমি আমার নিজের জন্য দুই একটা উপায় আবিষ্কার করিয়া

ফেলিলাম। প্রয়োজনের সময় মানুষ এম্নি করিয়াই তাহার পথ পাইয়া থাকে। ছাত্রটী বলিলেন, কাপড় চোপড় বাদে মাসে ৫০৲ টাকা দরকার হয়।

এই আলাপ করিবার পর হইতে, আমি মানসনেত্রে কলেজের বাড়ীঘর, দুয়ারজানালা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। শুধু তাহাই নয়, জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপকগণের চলা ফেরা এবং তাঁহাদের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যও যেন দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের সম্বন্ধে যত রকম উচ্চ ধারণা হওয়া সম্ভব তাহার কোনোটাই আমার কল্পনা হইতে বাদ পড়িল না। আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে বুঝিলাম, কলেজের বিদ্যা শেষ করিয়া বাহির হইতে আমার আট বৎসর লাগিবে। আমার যখন অর্থাভাব প্রবল, তখন আরো বেশি সময় লাগিবার কথা। হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমার সমুদয় দেনা পরিশোধ করিয়া কলেজ হইতে বাহির হইতে বারো বৎসর প্রয়োজন। যাহা হোক্ গ্র্যাজুয়েট ছাত্রটী আমাকে যথেষ্ট ভরসাতো দিলেনই, অধিকন্তু গ্র্যাজুয়েট না হইলে যে কোনো উন্নত এবং সভ্য সমাজে স্থান পাওয়া যায় না, তাহাও বলিয়াদিলেন। কলেজে যাইয়া আমাকে খাটিয়া খাইতে হইবে, এই জন্য, আমি পূর্ব্ব হইতেই লাটিন এবং গ্রীক এই দুইটী ভাষাই পড়িতে লাগিলাম।

এবারের গরমের বন্ধে বাড়ী আর যাওয়া হইল না।

ইস্কুলের একটী ছাত্রে সঙ্গে চাষের কাজ খুঁজিতে খুঁজিতে নিকটেই একটা কাজ জুটিয়া গেল। মালিক আমাদের চুলের ডগা হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত বেশ ভালোরূপে দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমরা একাজের কিছু জানো ?"

"আজ্ঞে জানি।"

"মৈ দিতে জানো ?"

"জানি মশায়।"

"বেশ ভালো মৈ দিতে পারো ?"

"কাজ দেখলেই বুঝ্‌তে পারবেন।"

"কত মজুরী চাও ?"

"যা আপনি উচিত বিবেচনা করবেন।"

"সে বেশ কথা। আচ্ছা তোমরা কোত্থেকে এসেছ বাপু ?"

"মশায় ! আমরা ছাত্র।"

চাষীর অনুমতি পাইয়া আমরা কাজে লাগিয়া গেলাম। ইতিপূর্ব্বে আর তিনজন লোক জমিতে মৈ দিতেছিল। চাষী তাহাদিগকে বলিল, এই দুইটী ছেলে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে। আমাদের ঘণ্টা খানেক কাজের পর, চাষী ঐ লোক তিনটীকে চেঁচাইয়া বলিল, "এই হাঁদারা দেখ্‌, ছেলে দুইটী তোদের তিনজনকে পেছনে ফেলিয়া গেল। উহাদের

লাঙ্গলের ফাল যেমন বেশি মাটী ভেদ করিয়া যাইতেছে, উহারা মৈও দিতেছে তেমনি চমৎকার।" লোক তিনটী জবাব না দিয়া প্রাণপণে কাজ করিতে লাগিল। আমরা আমাদের প্রশংসা শুনিয়া লোকটীকে নীরবে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলাম।

লোক তিনটীর সহিত কাজ করিবার সময় একদিন একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মনে হচ্ছে তোমরা ইস্কুলে পড়।"

"তাই বটে।"

"চাষের কাজ তোমরা কোথায় শিখ্‌লে?"

"চাষের যা কিছু কাজ তা আমরা বাড়ীতেই শিখেছি। চাষের উপরই আমাদের জীবিকা নির্ভর করে।"

"তোমরা কাজ জানো বটে। তোমাদের লেখাপড়ার এতে ক্ষতি হবে না?"

"আমি আশা করি এতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। যদি কোনো দিন এই রকম ধারণা মনে আসে, তবে সেদিন লাঙ্গল-জোয়ালকে জন্মের মতো নমস্কার দিব। আমি জানি, কর্ম্মই আমার একমাত্র শিক্ষক। যে কর্ম্ম মানুষকে মানুষ করিতে পারে না, তাহা কর্ম্মই নয় অকর্ম্ম— ইহাই আমার শিক্ষা।"

লোকটী বলিল, "তুমি কি প্রচারক হবার জন্য তৈরী

হচ্ছ ?”—সে সম্বন্ধে এখনো কিছুই ভাবিনি। আমার প্রথম ও প্রধান ইচ্ছা, প্রচারক হওয়ার আগে নিজেকে মানুষ করা। যদি তাতে সফল হই, তারপর অন্য বিষয় ভাবিব, এবং সত্য সত্যই, তখন আমার অন্য কিছু করার পক্ষে আর বাধাও থাকিবে না।”

কাজ শেষ হইয়া গেলে যেদিন আমাদের পাওনাগণ্ডা চুকাইয়া দেওয়ার কথা, সেদিনকার ব্যাপারটা একবার শুনুন। মালিক চোখে চশমা আঁটিয়া চশমাটাকে নাকের আগায় নামাইয়া দিয়া বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, “ওহে ছোক্‌রারা এখন বল দেখি, তোমাদিগকে কত দিতে হইবে।”

“আপনি যা উচিত বিবেচনা করেন।”

চাষী মহাজনটীর মুখে বারবার “ছোক্‌রা” শুনিয়া শুনিয়া আমরা বেশ বুঝিয়াছিলাম, তিনি আমাদিগকে কম পয়সায় বিদায় করিবার মতলবে আছেন। শেষ পর্য্যন্ত, আমাদের ধারণাই সত্য হইল। আমরা যে পূর্ণবয়স্ক লোকের মজুরী পাইতে পারিনা, সেটা খোলাখুলি বলিয়া ফেলিলেন।

আমার রাগ হইল, কিন্তু রাগ চাপিয়া ধীরভাবে বলিলাম, “দেখুন্ ছেলেরা যদি জোয়ান মরদের সমান কাজ করে তখনো কি তাদের মজুরীর তফাৎ থাকা উচিত ?”

তিনি অবশ্য, ছেলের এবং বুড়ার কাজের ভিতর যে একটা

পার্থক্য থাকেই, তাহা বেশ ভালোভাবে একটা সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। এবং বক্তৃতাটা কি রকম জমিয়া উঠিল মাঝে মাঝে এক একবার সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। আমি আর চুপ করিয়া থাকা উচিত মনে করিলাম না। বলিলাম, আমরা যখন কাজ করিতেছিলাম, তখন আপনার লোকদিগের নিকট আপনিই আমাদের কাজের প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন পয়সা দেওয়ার বেলায় বলিতেছেন, "তোমরা ছেলে মানুষ।" "যদি আমরা, এক একজন জোয়ান মরদের কাজ করিয়া থাকি, তবে আপনার কথা মতো আমাদের তাহাইতো পাওয়া উচিত।"

বোধ হয় আমরা বিশেষ সুবিধার লোক নই ভাবিয়াই লোকটী আর আপত্তি না করিয়া আমাদের কথায় রাজি হইল। পয়সা দিতে যাইয়া বলিল, "ছেলে মানুষ হইয়া এই প্রথম তোমরাই জোয়ানের মজুরী লইয়া গেলে"। আমি বলিলাম, চিরদিন আমরা ঠিক এই রকমই আদায় করিতে থাকিব। চাষী আমাদের উপর অনেক আশীর্ব্বাদ ছড়াইলেন—কি কর্ম্ম জগতে, কি জ্ঞান জগতে—কোথাও একতিল জায়গা বাদ পড়িল না।

এই সময়ে দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদকল্পে দেশময় একটা বিরাট আন্দোলন চলিতেছিল। সহর ও পল্লীর যেখানেই কিছু শিক্ষা, কতকটা চরিত্র এবং কিয়ৎ পরিমাণেও দরদ ছিল,

সেইখানেই এই আন্দোলন হাওয়ার চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গিয়া আপনাকে প্রচার করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মমন্দিরের বেদী হইতে বিদ্যালয়ের আলোচনা সভা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এ সম্বন্ধে জোর আলোচনা চলিল। যাঁহারা দাসত্বের চরম শত্রু, চিরদিন আমিও তাহাদেরই একজন। এই দাস ব্যবসায়, এই দাসত্ব প্রথার প্রবর্ত্তন, এই দাসত্বের পৃষ্ঠপোষকতা—ইহার চেয়ে অপরাধজনক কোনো কার্য্য মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে কখনো করিয়াছে, একথা আমি শুনি নাই। জগতের সকল দেশ ছাড়িয়া ভগবান কেন যে এই ইয়াঙ্কি স্থানকেই ইহার পীঠস্থান করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। একটা দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী আজন্ম অভিশাপগ্রস্ত, কুকুর বিড়ালের চেয়েও হেয়, জন্মের মতো গোলাম ইহার চেয়ে বড় অপমান মানুষের ভাগ্যে আর কিছু ঘটিতে পারে কি? ইহা আমাদের পক্ষে ঘোর কলঙ্ক। একদল লোক মাথা তুলিয়া নিজের ইচ্ছামতো নির্ম্মল আকাশ তলে বিশুদ্ধ বায়ু ও উজ্জ্বল আলোক উপভোগ করিতে চাহিতেছে; আর, আর একদল লোক নিজেদের দেহের পুষ্টির জন্যই লৌহদণ্ডহস্তে পুরুষানুক্রমে তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে চাহিতেছে। যে যুবক এবং যাহার শরীরের রক্তবিন্দুতে কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্বও আছে, বাধ্য হইয়াই সে এইরূপ ঘৃণিত প্রথার উচ্ছেদকল্পে প্রাণ দিবার নিমিত্ত তৈরী হইবে।

আমি কেবলই ভাবিতাম, যাহারা ইংরেজের নিগড় ভাঙিয়া স্বাধীন হইবার জন্য এত যুদ্ধ এত কষ্ট করিয়াছিলেন, সেই তাহারাই আবার অপরের জন্য নিজ হস্তে সর্ব্বনাশী শিকল বেড়ী তৈরী করিয়া দিলেন। ইহার চেয়ে দুঃখের এবং লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে! গণ্যমান্য এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কি করিয়া এই ব্যাপারে একবাক্যে সায় দিয়াছিলেন, তাহা আমি আজিও ভাবিয়া পাই না।

আমি সেই সময়েই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলাম, এত বড় অন্যায় যে মানুষ গায়ের জোরে আজ অবাধে চালাইয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছে, তাহাকে একদিন স্বদে আসলে তাহা পরিশোধ করিয়াই রেহাই পাইতে হইবে। ইহার অন্যথা হইবার জো নাই।

আমার যুবক বন্ধুগণকে বলিয়াছি, যাহা প্রকৃত পক্ষে ন্যায়ানুমোদিত তাহা করিতে কখনো দ্বিধা করিও না। সত্য জয়ী হইবেই—তুমি সাহায্য কর, আর নাই কর। একদিন না একদিন অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য কেহ না কেহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেই। ইতিপূর্ব্বে জগতে কতবার কত প্রচণ্ড অন্যায়ের গগনস্পর্দ্ধী মুকুট ধূলায় লুটাইয়াছে, ভবিষ্যতেও লুটাইবে। কাজেই মানুষের কর্ত্তব্য হইতে নিজেকে নিরপেক্ষ রাখিয়া, নিজে হীন হওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় না।

লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মানব যদি আমারই দুর্ব্বল বাহুর

সহায়তায় বাঁচিয়া যায়, আমার এক ফোঁটা অশ্রুজলে যদি তাহাদের হৃদয়ের জ্বালা দূর হয় তবে আর ভাবিবার কি আছে! আমার বিবেচনায়, যাহারা দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদকল্পে কোনো চেষ্টাই করে নাই তাহারা আর ঐ সকল দাস ব্যবসায়ীরা এবং দাসের মালিকরা একই পর্য্যায়ভুক্ত।

বন্ধুগণ, দুর্ব্বলের জন্য এক ফোঁটা অশ্রু ফেলিয়া এবং একখানা হাত বাড়াইয়া মুদীর হিসাবের দিক হইতে লাভের অঙ্ক হয়ত কিছুই দেখা যায় না। হয়ত উহা একটা ভাবুকতা ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু উহার দ্বারাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে মানুষ করিয়া তোলা যায়। আমি তখন যুবক ছিলাম এবং আজিও আমি যুবক। আমি চিরদিন পতিতের জন্য, দুর্ব্বলের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই দাঁড়াইব। আমি আর কাহারো উপর এত বড় দায়িত্ব চাপাইতে পারিনা; কেবল আমার নিষ্কলঙ্কচিত্ত যুবক বন্ধুগণই গোলামকে মানুষ করিতে, গরীবের পেটের জ্বালা দূর করিতে এবং ব্যথার ব্যথী হইয়া অশ্রু মুছাইতে পারে। দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদকল্পে বিদ্যালয়ের আলোচনা সভায় আমি তখন ইহার অনেক কথাই উল্লেখ করিয়াছিলাম। জগতের পরম মঙ্গলের জন্য যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম।

এই সময়ে একটী যুবকের সঙ্গে দেখা হয়। সে হিরাম

একলেক্‌টিক্‌ ইন্‌ষ্টিটিউটের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিল। আমার অন্য কোনো কলেজ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই ছিল না। কাজেই তাহার কাছে একটা নূতন খবর পাওয়া গেল। বিদ্যালয়টীর ছাত্র সংখ্যা শতাধিক, আরো ছাত্র চারিদিক হইতে আসিতেছে। আর শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও উত্তম।

শীতের বন্ধের পূর্ব্বেই আমার এখানকার পাঠ সমাপ্ত হইয়া গেল। শিক্ষকদের আশিষ এবং ছাত্রদের ভালোবাসা সঙ্গে লইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিলাম—১৮৫০ সালের নবেম্বর মাসে। শীতকালে শিক্ষকতা করিবার জন্য কাজ জুটিয়া গেল, আমার পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্র হ্বারেন্‌স্‌ভিলার ইস্কুলে। খাওয়া থাকা বাদে এবারে তাঁহারা নিজে হইতেই আমাকে মাসিক ৫৬৲ টাকা হিসাবে দিতে চাহিলেন। এই টাকার চুক্তির সঙ্গে আরও কয়েকটা বস্তু ছিল তাহা তাহাদের অকৃত্রিম স্নেহ, সহৃদয়তা এবং শ্রদ্ধা। বুঝিলাম, পূর্ব্ববারের কর্ম্মের সুদ ছাড়া ইহা আর কিছুই নহে। এবার আমার ভাগ্যে যাহা আসিল, হিসাব করিয়া দেখিলাম, তাহা চক্রবৃদ্ধি সুদের হারেই আসিয়াছে।

শীতের শেষে বাড়ী পেঁাছিয়া দেখিলাম, মা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য তৈরী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বোচ্‌কা বুচ্‌কি বাঁধা শেষ। এখন দেরী যা তা কেবল রওনা হইতেই। আমাকে দেখিয়া মা যাইবার জন্য বলিলেন।

আমি বিশেষ ইচ্ছুক ছিলাম না। কারণ, বন্ধের পর বিদ্যালয়ের নূতন বৎসরে আমি যে হিরামে যাইব তাহা মাকে বলিলাম। সেখানে আমার খরচ পত্র চালাইয়া লইতে পারিব জানিয়া, মা খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলিলেন। যাহা হোক্, মা আমাকে জুলাই মাসে কলেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন। আমিও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, নানা লোকজন নানা জায়গা দেখা যাইবে। এমন কি, চেষ্টা করিলে রোজগারের পথও হইয়া যাইতে পারে।

বাড়ী হইতে রওনা হইয়া আমরা ক্লীভল্যাণ্ডে পৌঁছিলাম। মনে পড়িল, এইখানেই মাতাল কাপ্তেনের গালাগালি শুনিয়াছিলাম আবার এইখানেই আমার নৌকার মাল্লাগিরিও জুটিয়াছিল। আমার জীবনের একটা নূতন শিক্ষাক্ষেত্রে এইখানেই প্রবেশ লাভ ঘটে। ক্লীভল্যাণ্ড হইতে কলম্বাস পর্য্যন্ত রেলপথ, তখন সবেমাত্র খোলা হইয়াছে। আমি ঐ দিনই সর্ব্বপ্রথমে রেলগাড়ীতে চড়িলাম। ইতিপূর্ব্বে রেলগাড়ী আর কখনো দেখি নাই। কাজেই, সেদিন এই বস্তুটী আমার কাছে শুধু নূতন নয়, পৃথিবীর একটা আশ্চর্য্য সম্পদ বলিয়াই মনে হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তারাজ্যে একটা ভয়ানক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। মনে মনে ভাবিলাম, মানুষের প্রতিভা ও চেষ্টার বিজয় ঘোষণা, এই রেলগাড়ী।

যুক্তরাষ্ট্রের দরবার গৃহ তৈরী হইয়াছিল কলম্বাসে। তখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে দরবার গৃহের একটা বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম মাত্র। আমি দর্শক হিসাবে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগ দিলাম এবং দরবারের আইন রচনার শক্তি দেখিয়া আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেদিনের কথা আজিও আমার স্মৃতিতে রহিয়াছে। মাকে বলিলাম, দরবার গৃহ এবং ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন দেখিয়া, আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে। ইহাদের যে কোনো একটী বিষয় আমার একমাসে ইস্কুলে জ্ঞানলাভ করার সমান। এই ব্যাপারে লোকহিতকর কার্য্য সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা জন্মিয়াছিল।

পথে আসিতে আসিতে জলে স্থলে আলোকে অন্ধকারে নানা শোভা দেখিতে দেখিতে মা ও আমি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। আত্মীয়স্বজনের আদর আপ্যায়নের ভিতর দিয়া তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। আমি ইতিমধ্যে একটা ইস্কুলে কাজ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলাম। খাওয়া থাকা বাদে মাসিক বেতন ৩৭॥০ টাকা ঠিক হইল। মাস তিনেক পড়াইয়াছিলাম।

ইস্কুল ঘরটা, সাধারণ ভাবে তৈরী একটা 'লগ-কেবিন' মাত্র। জন ত্রিশেক ছেলে পড়িত। ইস্কুল ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, এটা অভিভাবকগণের ঠিক ঠিক দরদ দিয়া তৈরী হয় নাই।

ইস্কুলটা যেন একটা ফ্যাশানের সামিল ছিল। একটা দায় উদ্ধার করার বস্তুমাত্র। সকল জায়গায় ইস্কুল আছে, আমরাই বা কম কিসে, এই মিথ্যা অহঙ্কারের উপর একটা মিথ্যা গৌরব আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল মাত্র। কাজেই অভিভাবকগণ ছাত্রদের অভাব অসুবিধার কোনো খোঁজ লইতেন না আর ছেলেরাও ইস্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন বুঝিত না। যে সময়ে মাষ্টারী আরম্ভ করি, সেই সময় পুরাদস্তুর শীত। অথচ আগুনের কোনো বন্দোবস্ত সেখানে ছিল না। ইস্কুলের নিকটে একটা নদীর ধারে অল্প মাটীর নীচেই কয়লা ছিল। আমার কথামতো ছেলেরা মাটী খুঁড়িয়া কয়লা তুলিয়া আনিল। কয়লা জ্বালাইয়া ইস্কুল ঘরটা গরম করিয়া ফেলিলাম।

হ্বারেন্স্‌ভিলার ছাত্রদের মতো ইহারা কোনো বিষয়েই অগ্রসর ছিলনা বটে, কিন্তু যে ইস্কুলে আমি সর্ব্বপ্রথম মাষ্টারী করি সেখানকার ছাত্রদের মতো ইহারা বর্ব্বরও ছিল না। লোকদের সভ্যতা জ্ঞান তখনো জাগে নাই সত্য কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক সরলতাই আমার নিকট তাহাদের যথেষ্ট ভদ্রতার পরিচায়ক হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আমার কার্য্যকাল শেষ হইলে আমি আমার ছাত্রগণের শ্রদ্ধাভক্তি এবং বিশ্বাস লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। মনে মনে ভাবিলাম প্রকৃত শিক্ষা পাইলে হয়ত ইহারাই একদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত সেবক হিসাবে

গণ্যমান্য হইয়া পড়িবে। সত্য সত্যই, ইহাদিগকে ছাড়িয়া আসিতে আমি অন্তরে যথেষ্ট ব্যথা পাইয়াছিলাম। কারণ, তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাহাদিগকে অজ্ঞ অসভ্য বলিয়া থাকেন, আমি তাহাদিগের ভিতরে কাজ করিয়াই যেন সব চেয়ে বেশি আনন্দ পাইয়াছি।

১৬

তখন ১৮৫১ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ। আমি হিরামে পৌঁছিয়াই কলেজের প্রিন্‌সিপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার মনে করিলাম। কলেজ খুলিতে আর অল্প কিছুদিন অবশিষ্ট আছে। প্রিন্‌সিপালকে খুঁজিতেই ঝাড়ুদার বলিল, "তিনি এখন ম্যানেজিং কমিটিতে আছেন।" আমি দেখা করিতে পারি কিনা সে বিষয়ে তাহাদের মতামত জানিতে চাহিলে, ঝাড়ুদার ফিরিয়া আসিয়া আমাকে তৎক্ষণাৎ লইয়া গেল। তাঁহারা সকলেই একে বয়োবৃদ্ধ তার উপর আবার এক একজন জবরদস্ত পণ্ডিত। বলা বাহুল্য, আমার পোষাক-পরিচ্ছদ একেবারেই সভ্য সমাজের উপযোগী ছিল না। তথাপি তাঁহারা সকলেই আমাকে যথেষ্ট স্নেহের সহিত সকল কথা খুলিয়া বলিবার অনুমতি দিলেন। আমি যেন অকূলে কূল পাইলাম, বলিলাম, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমি একজন দরিদ্র শিক্ষার্থী। কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিবার জন্যই আপনাদের নিকট আসিয়াছি।" সভাপতি বলিলেন, "বেশতো, ঠিক জায়গায়ই তুমি আসিয়াছ। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানিতে পারি কি ?"

—"মহাশয়, আমার বাড়ী অরেঞ্জে। আমার নাম জেম্‌স্

আব্রাম্‌ গার্‌ফীল্‌ড্‌। আমি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছি। আমার মাতা বিধবা ইলাইজা গার্‌ফীল্‌ড্‌।"

—"তোমার পারিবারিক অবস্থা বোধ হয় খুবই অসচ্ছল ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ ; তবে এ পর্য্যন্ত আমি নিজেই নিজের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। এখন যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ইস্কুলের ঘণ্টা বাজাইবার এবং ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজটা আমাকে দেন, তাহা হইলেই আমার খরচের কতকটা ব্যবস্থা হইয়া যাইতে পারে।"

—"তুমি কতদিন ইস্কুলে পড়িয়াছ ?"

—"এই মাত্র চেষ্টার বিদ্যালয় হইতে তিন বৎসর পর বাহির হইয়া আসিয়াছি। এই সময়ের ভিতর কয়েক বার শীতের ইস্কুলেও পড়াইয়াছি।"

এই কথায় তাঁহারা খুব খুসি তো হইলেনই, অধিকন্তু আমি যে অনেকখানি অগ্রসর, ইহাও বলিলেন। আমি আমার বক্তব্যের সঙ্গে গ্রীক্‌ লাটিন পড়ার কথাটাও উল্লেখ করিয়াছিলাম।

কর্ত্তৃপক্ষের এক ব্যক্তি সভাপতিকে বলিলেন, "এই যুবকটীর জন্য আমাদের যথা সাধ্য চেষ্টা করা উচিত মনে করি।" সভাপতি ইহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি জানাইলেন। কর্ত্তৃপক্ষের অন্য একব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি যে পছন্দসই ঘর ঝাঁট দিতে এবং ঠিকমতো সময়ে ঘণ্টা বাজাইতে পারিবে তার প্রমাণ কি ?"

আমি বলিলাম, "পরীক্ষা করুন। মাত্র দুই সপ্তাহ আমাকে সময় দিন। যদি আমার কাজে আপনারা সকলে খুসি না হন, তাহা হইলে আমি একটী কথাও না বলিয়া কাজ ছাড়িয়া দিব।" এই সময়ে আমার বয়স উনিশ বৎসর।

হিরাম একটী ছোট খাটো শহর। রেলের ধার হইতে মাইল বারো দূরে অবস্থিত। শহরের কেন্দ্রস্থলে চৌরাস্তার মোড়ে, গুটী দুই গির্জ্জা এবং খান পাঁচ ছয় অট্টালিকা ছিল। ইহাই ছিল তাহার সম্পদ। আমার নিকট এই বিদ্যালয়টী সব দিক দিয়াই নিজের রক্তমাংসের মতো হইয়া পড়িয়াছিল। এতটা বলায় আপনারা হয়ত খুবই আশ্চর্য্য হইবেন। কিন্তু সত্য সত্যই, হিরামে ছিল স্বাধীনতা; হিরামে ছিল জ্ঞানলাভের চরম সুযোগ; হিরামে ছিল যুবক মনের বিভিন্নমুখী জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিয়া শীঘ্র শীঘ্র জগতের সঙ্গে পরিচয় করাইবার নিমিত্ত বিরাট আয়োজন; হিরামে ছিল কর্ম্মক্ষমতা ও চরিত্র বিকাশের এক অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা; তারপর শিক্ষকেরা সকলেই ছিলেন জ্ঞানরাজ্যের এক একজন দিক্‌পাল। ইহার চেয়ে ছাত্রের পক্ষে আর কিছু বাঞ্ছনীয় থাকিতে পারে কিনা আমি জানিনা। অন্ততঃ আমার নিকট সেদিন ইহার চেয়ে আর বেশি কিছুই কাম্য ছিল না।

ইস্কুল খুলিল। চারিজন ছাত্রের সঙ্গে এক ঘরে আমার

থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। শুধু তাহাই নহে, শয়নের পক্ষে যতটা আরাম দরকার কর্ত্তৃপক্ষ আমার জন্য তাহার চেয়ে কম কিছুই করেন নাই। কিন্তু "যার খে'তে নাই, তার শু'তে রাঙাপাটীর কি দরকার!" পড়া শুনার ব্যাধিটা আমার ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল। ছাত্ররা মনে করিল লোকটা অদ্ভুত। শুধু এই কারণেই আমি আমার ছাত্রবন্ধুগণের ভালোবাসা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। ঘণ্টা বাজাইবার কাজে লাগিবার পর হইতে বাধ্য হইয়া আমাকে খুব ভোরে উঠিতে হইত। কারণ প্রথম ঘণ্টা ভোর পাঁচটায় বাজাইতে হইত। এক মিনিট এদিক ওদিক হইবার জো ছিল না। ঝাড়ুদারের কাজও আমাকে সকালে উঠিতে বাধ্য করিয়াছিল। চট্‌পটে স্বভাবটাই ছিল সেখানকার একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। এই স্বভাবটা আমাকে হিরামে যাইয়া অর্জ্জন করিতে হয় নাই। আমরা ছোটবেলা হইতে যে দায়িত্ব মাথায় লইয়াছিলাম, উহাই আমাদিগকে ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র চিরদিন জয়ী করিয়া আনিয়াছে। বাল্যকালেও অধিক বেলা অবধি বিছানায় পড়িয়া থাকা, আমার মা আদৌ পছন্দ করিতেন না। সেই জন্যই ঝাড়ুদারের কাজে, সকালে উঠিতে গিয়া আমাকে কোনো অসুবিধা বোধ করিতে হয় নাই। যে কোনো কাজের জন্য আমি সর্ব্বদাই তৈরী থাকিতাম বলিয়াই কোনো অবস্থাই আমার মাথাটা নোয়াইতে পারে নাই। আমাকে

সদাসর্ব্বদা হুঁশিয়ার দেখিয়া অবস্থাই শত শত বার আমার কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

একদিন আমার সমগৃহবাসী এক বন্ধু বলিল, "জেম্‌স্‌, তুমি যেমন সুন্দর আবৃত্তি করিতে পার, ঘর ঝাঁট দেওয়াও তোমার তেমনি সুন্দর হয়।" আমি বলিলাম, "অনেক লোক আছেন তাঁহারা কোনো কোনো কাজ বেশ ভালো ভাবে করেন। সকল কাজ ঠিক সমান ভাবে করেন না বা করিতে চাহেন না। চৌখস কর্ম্মী যাহাকে হইতে হইবে, তাহার সকল দিকে সমান নজর থাকা চাই। ছোট বেলা মা'র কাছে শিখিয়াছিলাম, যে একটা কাজে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে সে আর পাঁচটা কাজেও কৃতিত্ব দেখাইবেই। সোজা কথায় ইহার অর্থ আমি এই বুঝিয়াছিলাম যে, কোনো একটা কাজ যদি ভালোভাবে সম্পাদন করা যায় তাহা হইলে তাহার ফল, অপরের প্রশংসা এবং কর্ম্মীর আনন্দকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্ম-কর্ত্তাকে এমন ভাবে সাম্‌নে ঠেলিয়া দিবে যে, অতঃপর বাধ্য হইয়া তাহাকে আর একটা কাজ ভালো ভাবে শেষ করিতেই হইবে এবং ক্রমেই ইহা অভ্যাস হইয়া যাইবে। কর্ম্ম জগতে ইহার মূল্য কম নয়। আমি যদি আমার জীবনের সর্ব্ব প্রথম কর্ম্মটী ভালো ভাবে করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আজ কিছুতেই এইকাজে হাত দিতে সাহস করিতাম না। আমার কাছে সকল কাজেরই মূল্য সমান। কেননা, যেটীকে ছোট

মনে করা যায় সেইটী না হইলে চলে কি? আমার গ্রীক্ পড়া এবং ঘর ঝাঁট দেওয়া একই শিক্ষার অন্তর্গত। কাজে হাত দিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়াই শেষ করিতে হইবে। ইহাতে নিজেরই লাভ বেশি—ভিতরকার দৃষ্টিও খুলে। কোনো একটা কাজ 'যেন তেন প্রকারেণ' শেষ করিতে যে পরিশ্রম এবং সময় দরকার হয়, তার চেয়ে কম পরিশ্রমে এবং কম সময়ে ভালো ভাবে সেই কাজটাই শেষ করিতে পারা যায়। কোন একটা বিষয় বিশ্রীভাবে আবৃত্তি করিতে যতটা কষ্ট হয়, সেইটীই ভালো ভাবে আবৃত্তি করিতে ততটা কষ্ট করিতে হয় না, ইহা আপনারাও স্বীকার করিবেন।"

যাহা হোক, আজ আমার একটা আনন্দের বিষয় এই যে, হিরামে ঘণ্টা বাজাইয়া এবং ঘর ঝাঁট দিয়া আমি যে ছোট হইয়া যাই নাই, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি পরবর্ত্তী কালে অনেক গরীব ছাত্রকে সাগ্রহে সেই সেই কাজ করিতে দেখিয়া। আমার পূর্ব্বে নাকি কেহই সে সব কাজ করিতে সাহস করে নাই। ইহার দুইটী কারণ আছে। একটী না-জানার ভয়, অপরটী লোকনিন্দার দুর্ব্বলতা। প্রথমটী এমন মারাত্মক কিছু নয়। একদিন সকলেই অজ্ঞ এবং শিক্ষার্থী থাকে, পরে হাত পাকিলে সেই আবার দশ জনের শিক্ষক হয়। কিন্তু বড় ভয় লোকনিন্দার ভয়। দরিদ্রের আবার সেই ভয়টাই বেশি। ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অট্টালিকা বনিয়াদের দোহাই দিয়াই খাড়া

থাকে। আভিজাত্যের সংসারে দরিদ্রের যে সেই বনিয়াদ নাই, তাই সে প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়া ভীত হয়। এই জন্যই অনেক দরিদ্র আছেন, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ পুরুষপরম্পরায় কেন খ্যাতি লাভ করেন নাই তাহার জন্য তাহারা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। আমি বলিতে চাই ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তুমিই এই বীজটী বপন করিয়া যাও না কেন? অভিজাত বংশের সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত দৌলত নিজের সুখের জন্যই চিরদিন ভাঙ্গাইয়া থাকেন, কিন্তু দরিদ্রের যেন ইহা কাম্য না হয়।

আমি দরিদ্র হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া আমার দরিদ্র হৃদয় মন হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। চরিত্রবল যদি অভিজাত ব্যক্তিগণের এক চেটিয়া সম্পত্তি হইত তাহা হইলে সংসারে দরিদ্র হইয়া জন্মানোর মতো দুঃখের বিষয় আর কিছুই থাকিত না।

যাহা হোক, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আমি আমার চাকরীতে বহাল হইয়াছিলাম। ইস্কুলের সকল প্রকার কাজ— চাকরা এবং পড়া শুনা ব্যতীত অন্য সময়ে এক ছুতারমিস্ত্রীর কাছে কাজ করিয়া আমার খরচের অবশিষ্ট টাকাটা সংগ্রহ করিতেছিলাম।

১৭

এখন আমি ছাত্র, শিক্ষক এবং সূত্রধর, এই তিন ভিন্নরূপে এখানে অবস্থান করিতেছি। কারণ, হিরামে প্রথম বৎসর শেষ হইবার পর, কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে আমি জেনিটারের কর্ম্ম হইতে একেবারে ইংরেজী সাহিত্যের এবং প্রাচীন ভাষা সমূহের সহকারী শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। আমাকে এইপদে উন্নীত করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের অসীম উদারতার এবং যথেষ্ট অনুগ্রহের পরিচয়ই দিলেন। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কাজ করিলেন নিজেদের দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া। বুঝিলাম হিরামের জন্য তাঁহারা বাহির হইতে ভিন্ন আব্‌হাওয়ায় পুষ্ট শিক্ষক আমদানী না করিয়া, তাহার নিজের রসে পুষ্ট করিয়া, নিজের আদর্শে শিক্ষক গড়িয়া তুলিতে চাহেন। বুঝিলাম, কর্ত্তৃপক্ষ হিরামের একটা বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিতে ব্যস্ত।

আমি এখন ছাত্র এবং শিক্ষক, আবার শিক্ষক এবং ছাত্র। ছাত্ররূপে যাঁহাদের নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছি, হিরামে তাঁহাদের ভিতর কুমারী বুথ্‌ অপেক্ষা প্রতিভাশালী আর কেহ ছিলেন কিনা, জানিনা। গণিত শাস্ত্রকেই যেমন তিনি জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন, গণিত শাস্ত্রে তাঁহার সিদ্ধি-

লাভও হইয়াছিল তেম্‌নি। এই রকম তপস্যা না করিলে কেহ গণিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে না। তিনি বারো বৎসর বয়সে গণিতের যে সকল সমস্যা উদ্ভাবন করিতেন, তাহাতে তাঁহার শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়া যাইতেন, মনে মনে তাঁহারা যথেষ্ট রাগও করিতেন,—আবার বুথই তাহার জবাব দিতেন। গণিতে তাঁহার দক্ষতা ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন ভাষায় এবং ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁহার জ্ঞান কম ছিলনা। এই রকম রমণী দুইটী আমার চোখে পড়ে নাই। গণিত শাস্ত্র আমি তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রীক্ লাটিন এবং ইংরেজী সাহিত্য আমরা উভয়েই এক সঙ্গে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিয়াছি। যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হইয়াছিল বলিয়াই অন্তরও তাঁহার যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। অন্তরে ঈর্ষা দ্বেষের কালিমা একটুকুও ছিল না। আমার উপর একবার একটী প্রদর্শনীর জন্য প্রবন্ধ লেখার ভার পড়ে। আমি পাছে একটা সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলি এই ভয়ে তাঁহার সাহায্য চাহিলাম। তিনি স্বাভাবিক সহৃদয়তা দিয়াই আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

আবার ছাত্রীরূপে যাঁহাকে পাইয়াছিলাম তাঁহার নাম কুমারী লুক্রেশিয়া রুডোল্‌ফ্। লুক্রেশিয়া প্রথমে আমার গ্রীকবিভাগের ছাত্রী ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাঁহাকে অন্যান্য বিষয় পড়াইবার ভার আমার উপরই পড়িয়াছিল।

চেষ্টারে আমার শেষ বৎসরে এই রমণীর প্রথম সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। যেমনি লজ্জাশীলা এবং সরলা, তেমনি প্রতিভাময়ী। তাঁহার ঐ সকল গুণের সঙ্গে প্রখর বুদ্ধিমত্তার মিলন আমি তখনই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলাম। চেষ্টারে বহু ছাত্রীই পড়িতেন, কিন্তু আমি কখনো তাহাদের সঙ্গে মেলামিশা করি নাই এবং করার কোনো প্রয়োজনও বোধ করি নাই। স্বভাবতঃ লাজুক বলিয়া ঐ বিষয়ে আমি বেশ কাঁচা ছিলাম। মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিবার প্রলোভন আমার কোনো দিনই ছিল না। পাছে আমার কোনো ব্যবহার তাঁহাদের মর্য্যাদার হানি করে এই অজুহাতে আমি নিজের মঙ্গলের দিক হইতেই দূরে দূরে থাকিতাম। এমন কি, মেয়েদের চলা ফেরায়ও আমি উদাসীন ছিলাম। কিন্তু আমি বাধ্য হইয়াই লুক্রেশিয়ার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সকল দিক দিয়াই সমুদয় রমণীর চেয়ে তাঁহার বৈশিষ্ট্যটুকু যে কোনো লোকের চোখে ধরা পড়িত। হিরামে যে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে তাহা আমরা কেহই ভাবি নাই। ভাবিবার প্রয়োজনও কেহই বোধ করি নাই। কেন না, ভিন্ন দেশ হইতেই আমরা সকলে আসিয়া এখানে মিলিয়াছিলাম। বিদ্যালয়ের পরিচয়, ভালোবাসা বিশেষ জমাট না হইলে কেহ আর শেষ পর্য্যন্ত কাহারো খোঁজ লয় না। কাজেই, সেদিন লুক্রেশিয়ার পুরাতন পরিচয়টা

আবার আমার কাছে নূতনরূপে দেখা দিয়াছিল, তাঁহার পিতার উচ্চাকাঙ্খার গরজে। তিনি চাহিয়াছিলেন কন্যাকে তাঁহার স্বীয় প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্র করিয়া তুলিতে। সে বিষয়ে আমিও আমার যথা সাধ্য করিয়াছিলাম। আমার ছাত্র জীবন শেষ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে সময় লাগিয়াছিল। কাজেই দীর্ঘকাল পরেই তাঁহার কথা মতো তাঁহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়াছিল।

হিরামের ছাত্র জীবনে আর একটা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম। সেটী চিত্রবিদ্যা। কিছুকাল চর্চ্চা করার পর এই বিষয়ে আমি শিক্ষকতাও করিয়াছিলাম। ইচ্ছা থাকিলে সকলেই প্রত্যেক বিষয়ে কিছু-না-কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারেই। আমার অনেক যুবক বন্ধুই নানা দিক দিয়া জীবনটাকে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাদের শক্তি আছে যথেষ্ট, কিন্তু মন বুড়া হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই তাহারা প্রতিভার অধিকারী হইয়াও জগতের কোনো কাজে আসিতে পারেন নাই। আলস্য এবং অবহেলার চাপেই অনেক প্রতিভা মাথা তুলিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের সমাজ-সংসর্গের শিক্ষার চৌহদ্দিও এত ছোট যে, অনেকের মনোবলের স্ফুরণের পক্ষে উহাও একটা মস্ত বাধা। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্র বিস্তৃত থাকিলে এবং আলস্য ও অবহেলার কেনা-গোলাম না হইলে অনেক সাধারণ ব্যক্তিও যথেষ্ট

কৃতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তাহাদের সকলেই নব নব আবিষ্কার করিতে না পারিলেও আবিষ্কারের পক্ষে সকল সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়া থাকেন। তাহাদের অনুশীলনের ফলে যথেষ্ট পুঁথিগত বিদ্যার মূল্য ততক্ষণ দেওয়া যায় না, যতক্ষণ উহার দ্বারা কোনো কিছু সৃষ্টিলাভ না করে। সর্ব্বদাই এই সৃষ্টিলাভ কর্ম্মীর তাজা মনের উপর নির্ভর করে। যে কোনো সাধনায় মনকে ডুবাইয়া দিতে না পারিলে এইরূপ সৃষ্টি অসম্ভব। আমি ধর্ম্মমন্দিরের বেদীতে বসিবার অনুমতি পাইয়া ছিলাম ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চা করার জন্যই কিন্তু আমার ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য ইহারা শত শত ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন। ইহার আসল কারণ তাহারা জানিতেন না, কিন্তু আমি জানিতাম। তাহাদের প্রাণ, মামুলি ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে আমার নূতন ব্যাখ্যা শুনিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের জীবন অতি গতিশীল। উহা শয়নে স্বপনে ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সে পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতন নূতন বিষয় জানিবার জন্য, বুঝিবার জন্য, বলিবার জন্য, বুঝাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। সেই জন্যই, একই পুরাতন নব নব ভাবে, নানা সময়ে, নব নব রূপে দেখা দেয়, এবং আমরা নূতন রূপের পুরাতনকে গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হই। চিরস্থায়ী পুরাতন যত ভালোই হোক্, নবজাত শিশুকে ছাড়িয়া পুরাতন বৃদ্ধের ন্যায় আমরা সকল সময়ে তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিতে পারি না। তাই বলিতে চাই,

ধর্ম্মশাস্ত্র যত সত্যই হোক, ঈশ্বর যত মহান্ই হউন, মানুষ নব নব ভাবে তাঁহার মহিমা না শুনিলে তাঁহার কথা মোটেই ভাবিত না এবং একদিন যাহা শুনিয়াছিল, বুঝিয়াছিল, তাহাতেই মশ্গুল হইয়া অথবা বিরক্ত হইয়া বসিয়া থাকিত। নূতন চিন্তা নূতন ধারণা নূতন ব্যাখ্যা আমাদের চিত্তের সজীবতার লক্ষণ। কাজেই, আমি চাই জগতে নব নব ভাবের ভাবুক গায়কগণ চিরদিন নব নব বন্দনা গীতি গাহিয়া জগতকে সজীবতা দান করুন।

হিরামে পাঠ শেষ হওয়ার সমসমকালে একদিন কথা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয়, ভবিষ্যতে হিরামের সঙ্গে আমার কতটা সম্পর্ক থাকিবে জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, কলেজ হইতে বাহির হইয়া এখানেই আসিব এবং যতদিন প্রয়োজন হইবে আমি এই বিদ্যালয়ের সেবক ভাবেই এখানে অবস্থান করিব। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমরা সকলেই পূর্ব্ব হইতে এই জবাবই পাইব আশা করিয়া আসিতেছিলাম।

আমি যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক, এই হিরাম বিদ্যালয় তাহাদেরই প্রতিষ্ঠিত এবং একটা কলেজও তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেখানে গেলে আর্থিক দিক দিয়া আমার যথেষ্টই সুবিধা হইত। প্রথমে ইচ্ছাও ছিল সেই রকমই, কিন্তু পরে নানা দিক হইতে সে ইচ্ছার পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। প্রথম কারণ, তাহাদের পাঠ্য বিষয় পূর্ব্বাঞ্চলের

কলেজ সমূহের ন্যায় উন্নত শ্রেণীর ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, তাহাদের কলেজ দাস ব্যবসায়ের এবং দাস ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিত। তৃতীয় কারণ, আমি নিজে এবং আমার মাতা পিতা উক্ত সম্প্রদায়ের লোক। কাজেই অন্য ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে নিজের গণ্ডী ছাড়িয়া দূরে যাওয়াই উচিত।

এই সকল ভাবিয়া আমি পূর্ব্বাঞ্চলের বিভিন্ন কলেজে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া চিঠি দিলাম। জবাব দিলেন সকলেই, কিন্তু তাহা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি ব্যবসাদারী ধরণের। যেন বেশি বলিবার বা শুনিবার তাহাদের সময় নাই। একমাত্র উইলিয়াম্‌স্‌ টাউনের উইলিয়াম্‌স্‌ কলেজের সভাপতি ডক্টর হপ্‌কিন্‌স্‌ লিখিয়াছিলেন, "যদি তুমি এখানে আস, তাহা হইলে আমরা তোমার জন্য আমাদের যথাসাধ্য করিব।" দরিদ্র আমার নিকট এই কথা কয়টী সেদিন যে কত বড় ভরসার বস্তু ছিল তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন কি?

এই সময়ে আমার দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেমস্‌, টাকা পয়সার কি বন্দোবস্ত করিলে? এখন যে তোমার যথেষ্ট টাকার দরকার।" সত্যকথা বলিতে কি, এই সময়ে আমি যেন অনেকটা ভগবদ্বিশ্বাসী হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম। মানুষের, বিশেষতঃ আমার মতো লোকের নিকট, আশার অতিরিক্ত কিছু ঘটিলে এই রকম না হইয়া উপায় থাকে না।

জীবনভর অভাবের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। দৈনিক মজুরীর উপর যাহার বাঁচা মরা নির্ভর করিত, তাহার একটা মজুরী শেষ হওয়ার পর, আর একটা মজুরী যদি অসম্ভাবিতরূপে জুটিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে ভগবদ্বিশ্বাসই যে একমাত্র অবলম্বন হইয়া যায়। আমার পক্ষেও ঘটিয়াছিল তাহাই।

তখনও হিরাম পরিত্যাগ করিতে কিছু সময় আছে বটে, কিন্তু কলেজের জন্য টাকার চিন্তাটা জোর চলিতেছিল। হঠাৎ দাদার প্রশ্ন শুনিয়া আমার ভগবদ্বিশ্বাস বাড়িয়া গেল। আমি বলিলাম পূর্ব্বে যেভাবে কাটাইয়াছি এখনো সেই ভাবেই চলিতে হইবে, তা ছাড়া আর উপায় কি ?

দাদা বলিলেন, "যখন তুমি দুই বৎসর অগ্রসর হইয়া ভর্ত্তি হইতেছ তখন তোমাকে কলেজের পড়ার ক্ষতি করিয়া আমি খাটিতে পরামর্শ দিই না। এখন তোমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে। আমি তোমাকে টাকা ধার দিতেছি। টাকার ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া সসম্মানে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিলে, পরে তোমার পক্ষে এই টাকা ফিরাইয়া দেওয়া কষ্টকর হইবে না।"

—"ধরুন যদি আমি মরিয়া যাই, তখন আপনার টাকার কি হইবে ?"

—"সে চিন্তা আমার, সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

—"আমার জন্য আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আমি ভালো মনে করি না। তার চেয়ে একটা কাজ করিলেই সব দিক রক্ষা হইয়া যায়। আমি যদি দেড় হাজার টাকার একটা জীবনবীমা করি তাহা হইলে আমার মৃত্যুতে আপনার কোনোই ক্ষতি হইবে না।"

—"জেমস্‌, তোমার চেয়ে আমার টাকাটা কি এতই বড় ? ক্ষতি কি মানুষের জীবনে কখনো হয় না ?"

ধীর স্থির ভাবে পারিবারিক লাভ লোকসানের দিকটা দাদাকে বুঝাইয়া দিলাম। অগত্যা দাদা মন্দের ভালো বিবেচনা করিয়া দুঃখের সহিত রাজি হইলেন। আমি বলিলাম, আপনি কিছু মনে করিবেন না। এখন আমি একটু স্বস্তি বোধ করিতেছি।

দাদার টাকা মুখের কথায় ধার লইতে আমার আপত্তি ছিল না। চিরদিন নিজের পায়ে চলিয়া চলিয়া সেদিন ঐ ভাবে টাকা লওয়ার প্রবৃত্তিটা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। যাহা হোক অতঃপর দাদার হাতে আমার জীবন বীমার পলিসি খানা বুঝাইয়া দিলাম।

১৮

গরমের বন্ধের শেষে উইলিয়ামস্ টাউনে রওনা হইলাম। কলেজে যাইয়া দেখি ডাক্তার হপ্‌কিন্‌স্ ভর্ত্তি করিয়া লইবার জন্য নবাগত ছাত্রদের একে একে পরীক্ষা করিতেছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইলাম। অভিবাদন গ্রহণ করিয়া তিনি খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন মাত্র। আন্তরিক ব্যবহারের কোনো সাড়া না পাইয়া আমি নিজেই পরিচয় দিলাম, "আমার নাম গার্‌ফীল্ড, আমি ওহায়ো হইতে আসিয়াছি।" ডক্টর তৎক্ষণাৎ কেরাণীর নিকট আমার লিখিত দরখাস্তখানা চাহিয়া লইলেন। আমার মতো দরিদ্র, অজ্ঞ লোকের ভিতর তিনি কি দেখিয়াছিলেন জানি না। অনেকক্ষণ আমার করমর্দ্দন করিতে করিতে 'গার্‌ফীল্ড' 'গারফীল্ড' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম। জন্মদাতা পিতার স্নেহ কি বস্তু তাহা জানি না, কিন্তু সেদিন জ্ঞানদাতা পিতার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া যে স্নেহ পাইয়াছিলাম, তুলনায় উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ তাহা আমার পক্ষে তো বটেই, অন্যের পক্ষেও নির্ণয় করা বোধ হয় শক্ত বিষয় হইত। আমি যে তখন বিদ্যালয়ে ছিলাম এ কথা আমার মোটেই মনে ছিল না। এরূপ স্নেহ যে

আমার ভাগ্যে কখনো জুটিতে পারে, সেদিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি তাহা ভাবিতেই পারি নাই।

ডক্টর হপ্‌কিন্‌স্‌কে ভয় করিবার কিছুই ছিল না, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আমি শ্রদ্ধায় মাথা নত করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই সকল ব্যক্তির ইহাই বিশেষত্ব। লোককে দেখাইবার জন্য পয়সা খরচ করিয়া ইঁহাদিগকে ভয় খরিদ করিতে হয় না। আমি দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এবং স্বল্পকেশ মস্তক দেখিতেছিলাম। লোল ভ্রূযুগল তাঁহার জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিতেছিল। আমার কণিকামাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই বুঝিয়াছিলাম, ইনি জ্ঞান রাজ্যের অন্যতম দিকপাল্‌।

আমাকে পরীক্ষা করিলেন। আমি পাশ হইলাম। পরীক্ষা একটু শক্ত রকমেরই হইয়াছিল। ডক্টর হপ্‌কিন্‌স্‌ খুব খুসি হইলেন। একদিন আমাকে বলিলেন, "যদি গরমের বন্ধে এবার এখানে থাক তাহা হইলে, তোমার ইচ্ছামতো কলেজের লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করিতে পার।" আমি রাজি হইলাম। এমন সুযোগ জীবনে আর কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না জানি না। অতঃপর কলেজে যে কোনো সময়ে পড়ার অনুমতি পাইয়াছিলাম। এত বড় বিরাট লাইব্রেরী আমার চোখে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো পড়ে নাই। এই সময়ে জার্ম্মান ভাষায়ও আমি দক্ষতা লাভ করিয়াছিলাম।

এই সময়ে হাতে আমার কাজ কর্ম্ম কিছুই ছিল না। এতাবৎকাল খাটুনির পর এখন বেশ একটু আরাম বোধ করিতে লাগিলাম। নিজের পড়াশুনা বাদে অন্য সময়ে শস্য-ক্ষেত্রে এবং পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতাম। চতুর্দ্দিকের ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষচূড় পার্ব্বত্য প্রদেশ আমার নিকট পশ্চিমাঞ্চলের একঘেয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের জোর পাল্টা জবাব বলিয়াই মনে হইল। কখনো নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে ঘুরিতাম, কখনো পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতাম, আবার কখনো সীমাহীন গভীর অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া চলিতে থাকিতাম। কোনো কোনো দিন দিগন্ত রেখায় পৌঁছিবার মতলব করিয়া চষা জমির উপর দিয়া অবিশ্রান্ত হাঁটিয়া চলিতাম। আমার পল্লী এবং তার আশ পাশের সঙ্গে আমি যেভাবে পরিচিত, ঠিক সেই রকম এই এলাকায়ও আমি পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। দীর্ঘ-কালের ভিতর এমন আনন্দ আর পাই নাই।

এবারে অর্থোপার্জ্জনের এক নূতন পন্থাই বলুন, আর ব্যবসাই বলুন আবিষ্কার করা গেল। আমার হস্তাক্ষর দেখিয়া লোকে ভালোই বলিত এবং সেদিনে হস্তাক্ষর ভালো হওয়াটা একটা মস্ত বড় বিদ্যালাভের সামিল বলিয়াই সাধারণের ধারণা ছিল। হস্তাক্ষরের উপর তাহাদের বেশ একটা মোহ ছিল। হস্তাক্ষরটা মক্‌শ করিয়া করিয়া সুশ্রী হইলে তাহারা দাস

ব্যবসায়ীদের আফিসে কেরাণীগিরি করিবার সুযোগ পাইত। বিদ্যা হিসাবে তাহারা হস্তাক্ষরকে আদর করে নাই। কাজেই, তাহাদের প্রয়োজন বুঝিয়া আমি শুধু হস্তাক্ষর শিক্ষা দেওয়ার জন্যই একটা বড় রকমের পাঠশালা খুলিয়া দিলাম। আমার কি আর্থিক, কি সামাজিক সকল দিকেই বেশ সুবিধা হইয়া গেল। আমি এই বিদ্যাটা শিক্ষা দিতে আসিয়া অভিভাবকদের যে একটা মস্ত উপকারই করিয়াছি, তাহা তাহারা আমাকে বার বার বলিয়াছিলেন। শুধু এই জন্যই অনেকে আমার বন্ধুস্থানীয় হইয়াছিলেন। জ্ঞানলাভের দিক দিয়া যাত্রাটা আমার পক্ষে খুবই মূল্যবান হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পরবর্ত্তী শীতের বন্ধ কাটিল নিউইয়র্কে। শহর হইতে মাইল ছয়েক দূরে এক পাড়াগাঁয়ে যাইয়া এক হস্তাক্ষর বিদ্যালয় খুলিয়া দিলাম। হাতে বেশ দু'পয়সা আসিতে লাগিল। ঐ গ্রামে আমাদের সম্প্রদায়ের এক ধর্ম্ম মন্দির ছিল। প্রচারকের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমি বেদীতে বসিবার অধিকার পাইলাম। আমার বক্তৃতার পর আমি জনসাধারণের সহৃদয়তা লাভ করিলাম। তাহারা অতঃপর আরো কয়েকবার আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই জনৈক আচার্য্যের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি একদিন আমাকে নিউইয়র্কের কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং বৎসরে ৩৭৫০ টাকা বেতন দিতে

রাজি হইলেন। পূর্ব্বাঞ্চলের কোনো কলেজের উপাধি লাভের দিক্ হইতে ইহা একটা বাঁধা হইয়া দাঁড়াইবে মনে করিয়া, আমি আমার আপত্তি জানাইলাম। তিনি আমার প্রয়োজনটাই বার বার আমাকে শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রয়োজনটা বোধ হয় এক আধবার উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা হোক, এজন্য আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম। আমি বলিলাম, এই টাকার চেয়েও বড় আমার কাছে, যে বিদ্যালয় হইতে আমি কলেজে আসিবার সুযোগ পাইয়াছি সেই হিরাম-বিদ্যালয়ের সেরা। টাকার দিক হইতে আপনারা আমাকে যাহা দিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার মতো দরিদ্রের পক্ষে খুবই প্রালাভনের বস্তু, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রলোভনের চেয়ে, হিরামের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে সাহায্য করা আমি অনেক বড় মনে করি। আমার এই উপাধি লাভের ফলে যশোলাভ হইবে আমারই, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ইহার ফলটুকু যাইবে হিরামের স্বার্থে। বিদ্যালয়টী এখনো শৈশবে। বাঁচিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে এবং এখনো দীর্ঘকাল তাহাকে এই চেষ্টা চালাইতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষও আমাকে পাইবার আশা রাখেন যথেষ্ট। কাজেই, আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি কাজে লাগাইয়া যদি কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে তাহা উপেক্ষা করা বোধ হয় বুদ্ধিমানের এবং মানুষের কাজ নয়।

টাকার প্রলোভন আমাকে ছোট করিতে পারিল না সত্য, কিন্তু অর্থাভাব আরো বিকট মূর্ত্তিতে নানারূপে দেখা দিল। আমার দাদা আমাকে যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, আমার প্রয়োজনের সময়ে খবর পাইলাম, তিনি ভয়ানক অসুবিধায় পড়িয়াছেন, টাকা পাঠানো অসম্ভব। কাজেই সেখানকার আশা রাখা বৃথা। এই সময়ে পোষাকও নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িল। এতদিন কোনো রকমে চালাইয়াছি, কিন্তু আর সম্ভব নয়। এক দামড়িও হাতে নাই যে, কাজ চালাই-বার মতো একটা তৈরী করাইয়া লইব। একদিন হঠাৎ একটু ভরসা পাইলাম। নিউইয়র্কের জনৈক বন্ধু তাহার এক পরিচিত দর্জ্জির সঙ্গে কথা কহিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন।

বন্ধুটী আমার, কিন্তু দর্জ্জি আমার কেহ নয়। বন্ধুর কথা মতো দর্জ্জির সঙ্গে দেখা করিলাম এবং তাহাকে আমার দরিদ্র জীবনের কথা জানাইয়া বলিলাম, যতটা সত্বর হয় আপনার টাকা পরিশোধ করিব, তবে ঠিক তারিখ দিতে পারিতেছি না।

দর্জ্জি হাস্‌কেল্‌ মহাশয় বলিলেন, "বেশ, বেশ, তাই হইবে। এই টাকার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। তুমি লেখা পড়া করিয়া যাও। এই টাকার জন্য আমার ব্যবসায়ের কোনোই অসুবিধা হইবে না। টাকা হাতে আসিলেই আমাকে দেওয়ার দরকার নাই। তোমার অন্য

খরচ করিয়া, নিজের আবশ্যক খরচ বাবদ হাতে রাখার পরও যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলেই আমাকে দিও। নতুবা আমি বিশেষ দুঃখিত হইব, জানিও।”

আমি যথা সম্ভব সত্বর তাঁহার টাকা পরিশোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার এই অসীম অনুগ্রহের কথা আজিও আমার মনে আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। মানুষ, দরিদ্র বলিয়া অপরের কাছে সাহায্য চাহিলে, দাতা দানটাকে ভিক্ষা বলিয়াই মনে করে। কিন্তু, আমার বিশ্বাস, যদি কোনো দরিদ্র ছাত্র কাহারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাহা হইলে নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তিও তাহাকে বিমুখ করে না, বরং সেজন্য সে নিজেকে নিতান্ত ধন্যই মনে করে। তাই, ছাত্র জীবনের গৌরব করে না এমন ছাত্র নাই এবং ছাত্রত্বের সম্মান করে না এমন লোকও বোধ হয় সংসারে নাই। আমি দরিদ্র বলিয়া দর্জ্জির কোনো অনুগ্রহই যে পাইতাম না, এটা ঠিক।

কলেজে ফিরিয়া আসিয়া দেনার চাপে চোখে সরষে ফুল দেখিতে লাগিলাম। দাদার কাছে লেখা বৃথা। আর কোনো পথ না পাইয়া ডাক্তার রবিনসন্‌কে—যিনি চেষ্টারে যাইবার পূর্ব্বে আমার দেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন—পত্র লিখিলাম। আমার ভবিষ্যৎ চাকুরী, জীবন বীমা ইত্যাদি বিষয়েরও উল্লেখ করিয়াছিলাম। কলেজ হইতে বাহির হইয়া যথা সম্ভব সত্বর টাকা পরিশোধ করিব ইহাও লিখিয়াছিলাম। তিনি অবশ্য

কিছুই লেখেন নাই, তাঁহার চরিত্রের তুলনায় কিছু লেখাও সম্ভব নয়। কেবল প্রার্থিত টাকা কয়টাই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

হিরামে থাকার সময় পলাতক দাসদিগকে ধরিয়া তাহাদের মনিবদের হস্তে সমর্পণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দরবার হইতে এক আইন জারী হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে দেশ ক্ষেপিয়া উঠে। দেশের এই ক্ষ্যাপামি এই সময়ে বাড়িয়াই চলিতেছিল। হিরাম হইতে এখানে আসিয়া আমি যেন এক নবযুগের নবীন ভাবধারায় ক্রমেই পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিলাম। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের অন্যতম সভ্য চার্লস্‌ সাম্‌নার মহাশয়, উক্ত আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া,"স্বাধীনতা জাতীয় কিন্তু দাসত্ব সাম্প্রদায়িক" এই কথা বলিয়া দাস ব্যবসায়কে ধাক্কা দিতে লাগিলেন। ক্রমে ইহাই তাঁহার সাধনার বস্তু হইয়া উঠিল। বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের হুইগ্‌ মন্ত্রিসভাকেও আমেরিকার দাসত্ব প্রথা রহিত করিবার জন্য জোর দিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার নির্ভীকতা এবং জনসাধারণের ভিতর কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি নিজেও দাসত্বের প্রতি একদিকে ডেমোক্রাট্‌দের ঘৃণ্য পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং অপর দিকে হুইগ্‌ মন্ত্রিসভার নিশ্চেস্টতা, ভীরুতা এবং নিরপেক্ষতা দেখিয়া নিন্দাবাদ করিতে লাগিলাম। ১৮৫৫ সালের প্রথমভাগে শ্রীযুক্ত গুড্‌রীচ্‌—কংগ্রেসের অন্যতম

সভ্য—উইলিয়ামস্ টাউনে এক বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতার মূল বিষয় ছিল, "দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদ।" তিনি কংগ্রেসের মুষ্টিমেয় রিপাব্লিকানদের দাস ব্যবসায়ের বিরোধিতায় যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তাঁহার ধারাবাহিক যুক্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। অতঃপর আমি নিজেকে আর দূরে রাখিতে পারিলাম না এবং পারাটাও উচিত মনে করি নাই। কাজেই রিপাব্লিকান দলভুক্ত হইয়া পড়িলাম। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসনে ফ্রীমণ্টকে বসাইবার জন্য আমরা প্রাণপণ করিয়া খাটিতে লাগিলাম। আমার রাজনৈতিক বক্তৃতার কেহ নিন্দা করে নাই। আমি বেশ বুঝিতে ছিলাম, আমার বক্তৃতা বেশ সরস হইতেছে। লোকের প্রশংসাকে আমি তাহার মাপকাঠি করি নাই, বিষয়টীতে আমি ক্রমেই যে মজিয়া-যাইতেছিলাম, ইহাই ছিল তাহার প্রমাণ। লোকের প্রশংসার দিকে নজর রাখিয়া বক্তৃতা দিলে, আর যাহাই হোক, সে বক্তৃতায় কাজ হয় না।

আমার এক সমপাঠী বন্ধু একদিন বলিয়াছিলেন, "দেশ তোমার নিকট আরো অনেক কিছু শুন্‌বে, আর এই জঘন্য দাসত্ব তোমার হাতের আঘাত না পাইয়া মরিবে না।" সেদিন ভাবিতাম, "আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি কি সত্য সত্যই মানুষকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া, মনুষ্যত্ব লাভের পথে ঠেলিয়া দিতে পারিবে!" গোলামীর সঙ্গে রফা করিয়া চলিতে নিজেও শিখি

নাই, অপরে সেভাবে চলে, তাহাও আমি কোনো দিন পছন্দ করি নাই।

১৮৫৬ সালে আমি সসম্মানে গ্রাজুয়েট হইলাম। ডক্টর হপ্‌কিন্‌স্‌ এই উপলক্ষে আমার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। কমিটীর সভ্যগণ এবং ছাত্রমণ্ডলী ও শিক্ষকগণ একবাক্যে তাহা মানিয়া লইলেন। সেদিনকার প্রশংসাকে আমার কর্ম্ম-জীবনের পাথেয়স্বরূপ বিবেচনা করিয়া হিরামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। হিরাম বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে "প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের" শিক্ষক নিয়োগ করিলেন। আমার আসিবার পূর্ব্বেই নাকি তাঁহারা এই পদটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। বহুদিন পরে এখানে ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন আনন্দটাকে আবার শতগুণ নূতন ভাবে উপভোগ করিলাম। ওহায়ো-পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া খালের মাঝিগিরি ছাড়িয়া আসিবার নয় বৎসর পরে আমি এখানে পৌঁছিয়াছি। আমি আমার উচ্চা-কাঙ্ক্ষার শিখরে উঠিয়াছি, পূর্ব্বাঞ্চলের কোনো বিখ্যাত কলেজের ডিপ্লোমাও আমার লাভ হইয়াছে, এখানে এখন আমি শিক্ষকরূপে অবস্থিত। এখন আমি আমার সকল শক্তি এই বিদ্যালয়ের জন্য নিয়োগ করিব। ইহাই আমার একমাত্র কাজ।

ধর্ম্মোপদেষ্টা কি রাজনৈতিক বক্তা হওয়া আমার জীবনের কাম্য কোনোদিনই ছিল না। হিরাম বিদ্যালয়কে পশ্চিমা-

ঞ্চলের জঙ্গলী মুল্লুকের একটী গৌরবের ও আদরের শিক্ষাকেন্দ্র করিয়া তোলাই আমার ব্রত ছিল। দৌলতের লোভ আমার কোনোদিনই ছিল না। সেদিকে যদি কাহারো লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে শিক্ষকতার দিকে তার না আসাই উচিত।

ডক্টর হপ্‌কিন্‌সের পাণ্ডিত্যই ছিল আমার একমাত্র লোভনীয় বস্তু এবং তাঁহার পদতলে বসিয়া যাহা কিছু শিখিয়া ছিলাম, তাহাই ছিল আমার শিক্ষক জীবনের মূলধন। উইলিয়াম্‌স্‌ কলেজে যাইবার পূর্ব্বে আমি এখানে পড়াইতাম। কাজেই, এক বৎসর অধ্যাপনার পর কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে শিক্ষক পরিষদের সভাপতি এবং আর এক বৎসর পর কলেজের অধ্যক্ষপদে উন্নীত করিলেন। ইহা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার নিকট এই পদোন্নতি তুল্যমূল্য। আমি দরিদ্র জনক জননীর সন্তান হইয়া সংসারে আসিয়াছিলাম, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিয়াই জীবনের বেশি সময় কাটাইয়াছি। সেদিন ঐ দরিদ্র জীবনের চরম আদর্শ ছিল শিক্ষকতা। আজ সেই পথে চলিতে চলিতে যদি কোনো লভ্যাংশ জুটিয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে আমার লুব্ধ হওয়াও যেমন উচিত নয়, উৎফুল্ল হওয়াও তেমনি ঠিক নয়।

আমাকে শিক্ষকতাকালে সময়ে সময়ে আর একটা কাজ করিতে হইত। যে সকল ছাত্র অসময়ে পাঠ ত্যাগ করিতে

বাধ্য হইত, তাহাদিগকে ঠিক পথে টানিয়া রাখাই ছিল আমার কাজ। বিত্থালয়ের কাজের সঙ্গে অবশ্য ইহার কোনো সম্পর্ক ছিল না। ধনীর সন্তান হইয়া না জন্মিলে বিদ্যালাভ অসম্ভব, এটা যেমন একটা প্রচলিত প্রবাদ, দারিদ্র্যের কঠোর চাপে অনেক প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভাও যে পলে পলে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, ইহাও তেমনি পরীক্ষিত সত্য। আজ আমেরিকার অনেক প্রতিষ্ঠানেই পাকড়াও করা ঐ সকল ছেলেরাই পরিচালকের পদে রহিয়াছে। কাহারো প্রতিভার বিরুদ্ধে বিদ্যালাভে ঘোর অনিচ্ছা, আবার কাহারো প্রতিভা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় দারিদ্র্যের নির্ম্মম সংহার মূর্ত্তি, নয়ত পিতার রুদ্রমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইত। এই সব বাঁধা ঠেলিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ সকলের জুটে না। আমার পেছনে আমার মার ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকিলে আমিও যে তাহাদেরই একজন হইতাম, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি যদি কিছু কাজের মতো কাজ করিয়া থাকি, তবে তাহা ঐ ভাবে ছেলে পাকড়াও করিয়াই করিয়াছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি ছেলেদের জ্ঞানলাভের পথে প্রতিবন্ধকরূপে তাহাদের বাপ খুড়া অথবা অন্য কোনো অভিভাবককে দণ্ডায়মান দেখিয়াছি। দুর্ভেদ্য প্রাচীরও হয়ত ভেদ করা সম্ভব, কিন্তু তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া, কি ভেদ করা অত্যন্ত কষ্টকর মনে হইয়াছে। আমি হিরামে এই প্রথার প্রবর্ত্তন না করিলে ঐ সকল ছাত্রেরা আজ

কোথায় থাকিত, তাহা এখন তাহারা বুঝিতে পারিতেছে। এইভাবে অনেক দিকে অনেক ছোটখাটো অবজ্ঞা ও খেয়ালের জন্য মানব সমাজের অনেক অমূল্য সম্পদ চিরদিনের মতো লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক যুবকের জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন একটা অতি সামান্য ঘটনাই তাহার জীবনের গতি একদম ঘুরাইয়া দেয়। তখন একদিকে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে যেমন বিশ্বাস হারাইতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে তেমনি কোনোকিছু করিবার পথ না পাইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে। হয়ত কাহারো পিতা মাতা গরীব, ছেলেকে আর পড়াইতে পারেন না, একদিন হঠাৎ আসিয়া বলিলেন যে আর লেখা পড়া শিখিয়া কাজ নাই, ঢের হইয়াছে মহাশয়! এই রকম পিতামাতারা, তাহাদের ছেলেরা কলেজ হইতে বাহির হইয়া কি করিবে সেই ভাবনায় বিষম ভাবিত হইয়া পড়িতেন। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এই রকম পিতারা ছেলেদের নিকট এত বেশি আশা করিতেন যে, যার ফলে ছেলেরা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান হইত। যেহেতু তাহারা লেখাপড়া করে সেই জন্যই তাহাদের অসম্ভবরূপে সাংসারিক উন্নতি করা উচিত। ইহাই ছিল তাহাদের অভিভাবকগণের যুক্তি। কাজেই, এই সকল ছেলেরা অসময়ে এই অসম্ভব চাপে ভাঙ্গিয়া না পড়িলে নিশ্চয়ই কৃতী হইত। আমার নিজ জীবনের পরিবর্ত্তনের কথা মনে হইলে, এই সকল যুবকের জন্য চোখের জল

থামাইতে পারি না। মানুষকে মনুষ্যত্বলাভের সুযোগ দিতে না পারিলে আমাদের জন্মগ্রহণের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা আমি জানি না।

একদিন একটী ছেলে আমার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া নমস্কার দিল। সেদিন বিদ্যালয় গরমের জন্য ছুটি হয়। আমি তখন কি একটা বিষয় লিখিতেছিলাম। তাহাকে তখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অনেকক্ষণ নীরবতার ফাঁকটুকু ঢাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হেনরী, বন্ধের পরে আবার আস্‌চো তো?" তাহার কোনো জবাব না পাইয়া মাথা তুলিয়া দেখিলাম, তাহার চোখ দুটী জলে ভরিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, তাহার অন্তরের অসহ্য যাতনা মুখে বলিতে পারিতেছে না, কিন্তু তাহা বলিয়া দিতেছে তাহার মুখ-চোখ। অনেক কষ্টে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কোনো রকমে জবাব দিল, "আমি আর হিংগ্যামে আসবো না। বাবা বলেচেন, লেখাপড়া যা হয়েচে এই যথেষ্ট, চাষের কাজে এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে না।"

—"তোমার বাবা এখানে আছেন?"

—"হাঁ, তিনি আমার সমুদয় জিনিষ পত্র গুছাচ্ছেন।"

হেনরীর চেহারায় সত্যই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তাহার চরিত্রের একটা গুণ ছিল এই যে, কাজের উদ্দেশ্য এবং তার ওজনটা সে বুঝিতে পারিত।

হেনরীকে বলিলাম, "তোমার বাবাকে ডাকিয়া আন। কিছু বলিও না, শুধু আলাপ পরিচয় মাত্র। যথাসময়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী আসিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের ইয়াঙ্কি গৃহস্থ। চেহারাখানি বেশ দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

—"আপনি বোধ হয় হেনরীকে নিয়ে যাচ্ছেন ?"

—"হাঁ।"

—"বন্ধের পরই আবার আসচে ?"

—"না। আমি আর তাহাকে পড়াইতে ইচ্ছা করি না। চাষীর পক্ষে যতটা দরকার, তার বেশি তার শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমি বেশ ভালোরূপেই জানি, বেশি লেখাপড়া শিখিলেই ছেলেরা কুঁড়ে হহয়া যায়। আপনার চাষী ছাত্রেরা কাজের চেয়ে বড় বড় কথা বলিতেই ওস্তাদ হয় বেশি। আমি দেখিয়াছি, হেনরীর কাজ কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য নাই ; কেবল পুস্তকের উপরই ঝুঁকিয়া থাকে। চাষের উন্নতি করা কি ধান চা'লের কোনো খোঁজ খবর রাখার সে কিছুই দরকার মনে করে না।"

"আপনাকে এ রকম কথা বলিতে দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখিত। হেনরীকে আমি বেশ ভালোভাবেই জানি। তার বুদ্ধি আছে, চরিত্র আছে, এবং সে অত্যন্ত বিশ্বাসী। এ পর্য্যন্ত যত ছাত্র পাইয়াছি সে সকলের উপরে। সে যদি বন্ধের

পরে আসে, তাহা হইলে আগামী শীতের ইস্কুলে পড়াইতে পারিবে। আপনাকে খরচের টাকা তো দিতে হইবেই না, অধিকন্তু বেশ দু'পয়সা আয় করিতে পারিবে। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ একটু কূল পাইলেন, বলিলেন, "আমি ঐ সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে পাঠাইয়া দিব।"

অর্থাভাবই ছিল এই ব্যাপারের মূল কারণ। অতঃপর হেনরী শীতকালের ইস্কুলে পড়াইয়া নিজের খরচের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। এই ভাবে সত্য সত্যই সে জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিল। হিরামের পাঠ শেষ করিয়া সে পূর্ব্বাঞ্চলের কোনো কলেজের শেষ পরীক্ষার ডিপ্লোমা পাইয়াছিল।

এই ভাবে বহু ছাত্র গড়িয়া তুলিয়া আমার শিক্ষালাভের এবং শিক্ষকতার সার্থকতা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ছাত্রকে মানুষ করিতে না পারিলে বা তাহাকে মনুষ্যত্বলাভের পথের সন্ধান দিতে না পারিলে আমার কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। এই রকম আরো অনেক উদাহরণ আছে; শুধু আমার যুবক শিক্ষক বন্ধুগণের জন্য একটা উল্লেখ করিয়া গেলাম।

২০

দাসত্বের পক্ষপাতী ডেমোক্রাট্‌দের সঙ্গে দাসত্বের বিরোধী রিপাব্‌লিকানদের ভয়ানক বিরোধ বাঁধিল। এই বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল বহু পূর্ব্বেই, কিন্তু ইহা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। যৌবনে পা দিয়াই পরিণতির জন্য ধ্বংসের জন্য ছুটিয়া চলিল। আমি তখন শারীরিক শক্তিতে, চরিত্র-বলে এবং সৎসাহসে সর্ব্বোত্তম জানিতাম, দাসত্বের ঘোর বিরোধী জন ফ্রীমণ্টকে। কাজেই হিরামে শিক্ষকতা করিয়াও প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঁচ হইতে দশ মাইল দূরে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ফ্রীমণ্টকে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি করিবার জন্য বক্তৃতা দিতাম। এই সময়ে আমার সঙ্গে এক একদিন এক একটী ছাত্র থাকিত। ভোরে যখন আমরা হিরামে ফিরিতাম, তখন হয় গত সন্ধ্যার বক্তৃতাটা আলোচনা করিতাম, আর নয়ত অন্য কোনো বিষয় ধরিতাম। ইহার ফলে ছাত্রগণের আলোচনার প্রবৃত্তি জন্মিতেছিল, এবং নূতন নূতন বিষয় লইয়া তাহারা মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতাও বোধ করিতেছিল।

ডেমোক্রাট্‌রাও নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। দাসত্ব যে খুব ভালো, ইহার গতি ও শক্তি যে প্রবল, ঈশ্বরলাভের একমাত্র পন্থাই যে

এই দাসত্বের মধ্য দিয়া, দুই হাত দুই পা-ওয়ালা মানুষনামক জীবদের পক্ষে মনিবের সেবা করিয়া ধন্য হওয়াতেই যে পরম পুরুষার্থ লাভ ঘটে, তাহা এই ডেমোক্রাট্‌রাই জগতে প্রথম প্রচার করিলেন। স্বার্থের জন্য মানুষ না করিতে পারে এমন হীন কর্ম্মও বোধ হয় নাই। ডেমোক্রাট্‌ নেতা আল্‌ফানসো হার্টই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই প্রকার জীবদের পদভরে যখন ইয়াঙ্কি স্থান কম্পিত, ইয়াঙ্কি সমাজ ভয়ে ভীত, ইহাদেরই নিকট দাসত্বের মহিমা শ্রবণ করিয়া যখন ইয়াঙ্কি চিত্ত ভক্তি গদগদ, তখন মাত্র জন কয়েক লোক এই ঘোর দাসত্বের প্রতিবাদ করিতেছিলেন। উদ্দেশ্যের কথা বাদ দিলেও, মুষ্টিমেয় রিপাব্‌লিকানদের মনের জোর এবং প্রাণের টান দেখিয়া ইহাদের মতে না চলিয়া উপায় ছিল না। অবশ্য ইতিহাসে এই রকম উদাহরণ যথেষ্টই রহিয়াছে। শক্তিমানের অপ্রতিহত শক্তির বিরুদ্ধে তাহারই গৃহকোণে বসিয়া জনকতক দুর্ব্বল লোক নীরবে নীরবে কোন্‌ শুভমুহূর্ত্তে যে আপনাদের বাঁচিবার উপায় খুঁজিতে লাগিয়া যায় শক্তিমান তাহা জানিতেই পারে না। একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, শতে শতে, হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে একই ভাবের ভাবুকতায় অনুপ্রাণিত দুর্ব্বলেরাই এক-দিন প্রবল শক্তিমান হইয়া পুরাতন শক্তিমানকে জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিয়া তাহার স্থান কাড়িয়া লয়। গণতান্ত্রিক আমেরিকার যে কোনো স্থানে সেদিন ডেমোক্রাট্‌রাই ছিল

সর্ব্বেসর্ব্বা। বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহারা চাহিয়াছিল একমাত্র নিজেদের ভোগসুখ এবং গোলামের গোলামীকে কায়েমী করিতে, কিন্তু তা কি হয়। গোলাম তাহার গোলামীকে প্রকৃত সুখশান্তির নিদান মনে করিলেই তো হইবে না, সৃষ্টির বিধানও তো একটা আছে।

আসল শক্তিটা রিপাব্লিকানদের যথেষ্টই ছিল। সোনা রূপার বাজারে তাহারা হয়ত ডেমোক্রাট্দের তুলনায় নিতান্ত গরীব ছিলেন, কিন্তু যে জোরে লড়াইয়ে সত্যিকার জোর ধরে তাহাতে তাহারা কোনো দিন দেউলিয়া হয় নাই। আলফান্সো হার্টকে জব্দ করিবার জন্য রিপাব্লিকান্রা যখন নিতান্ত বেদনা পীড়িতের ন্যায় আমাকে ডাকিতেছিল, তখন হিরামের শিক্ষকের আসনে বসিয়া এবং প্রিন্সিপালের কঠোর দায়িত্ব মাথার উপর চাপানো রহিয়াছে জানিয়াও আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মাথার বোঝা যতটা সম্ভব সাবধানতার সহিত মাটীতে ফেলিয়া দিয়া আমি ছুটিয়া গিয়াছিলাম। আমি নেতাকে বড় মনে করি না, বড় মনে করি তাহাদিগকে যাহারা নেতাকে ডাকিয়া খুঁজিয়া বাহির করে, টানিয়া হিঁচড়িয়া লইয়া চলে। যুগে যুগে মানবজাতির মঙ্গলের দিনে এই রকম অগণিত লোকের কোনো পরিচয় থাকে না, হিসাব থাকে না। তাহারা হিসাব দিতে আসে না, আসে তাহারা উত্তমর্ণের মতো হিসাব লইতে, নিজেদের কাজ শেষ হইলেই তাহারা সরিয়া

পড়ে। জাতির আসল শক্তি তাহারাই। ইহাদের প্রয়োজন হইলে শত শত গার্‌ফীল্ড ইহারা অনায়াসে তৈরী করিতে পারে, এ বিশ্বাস অন্যের না থাকিলেও আমার আছে। সেদিন ঐ জন কয়েক রিপাব্‌লিকানের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল। একমাত্র তাহাদের আগ্রহেব জোরেই আমি তর্কযুদ্ধে আল্‌ফানসোকে এমন ভাবে নীচে ফেলিয়া বুকে চড়িয়া বসিয়াছিলাম, যাহার পুরস্কার দিতে আমার দেশবাসী এক তিল কার্পণ্য করে নাই। তাহারা সেদিন ঐ রঙ্গভূমি হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসনটা আমাকে দেখাইয়া দিয়াছিল।

এক বৎসর পর তাহারা যখন আমাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করিতে চাহিল, তখন বলিলাম, "বন্ধুগণ আমায় আপনারা মার্জ্জনা করুন। এই বিদ্যালয় আমার কর্ম্মক্ষেত্র। আমার জীবনের যা কিছু কাজ তা এই বিদ্যালয়ের জন্যই। রাজনীতির ভিতর প্রবেশ করিয়া বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার কোনো দিনই নাই। কাজেই আপনাদের প্রস্তাব আমি বাধ্য হইয়াই প্রত্যাখ্যান করিতেছি"—

তাহারা আমার এই কথা শুনিয়াও যখন আমাকে রেহাই দিতে ইচ্ছা করিলেন না, তখন আমি আবার বলিলাম, দেখুন, আপনারা বুঝিতে পারিবেন কি না জানি না, কিন্তু আমি জানি আমার প্রাণ, আমার কর্ম্ম, আমার কর্ত্তব্য যা কিছু হিরাম।

দেখিলাম, 'টাগ-অব-ওয়ারে' এইবারের মতো আমিই জয়ী হইলাম।

১৮৫৯ সালে উইলিয়ামস্ কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজের উদ্বোধন দিবসে বক্তৃতা করিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি এই কলেজের ডিপ্লোমা লইয়া হিরামে ফিরিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে এরূপ অনুগ্রহলাভ আর কোনো ছাত্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। রিপাব্লিকান্দের অন্যতম বিদ্যাপীঠ উইলিয়ামস্ কলেজ আমাকে এভাবে সম্মানিত করিয়া সত্য সত্যই নিজেদের উদারতার পরিচয় দিলেন। আমাকে উন্নত দেখিবার জন্য ইহাদের প্রবল আগ্রহ দেখা গেল। এই ভ্রমণে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ আমার প্রিয় শিক্ষকগণ আমার স্ত্রী বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিলেন। পুরাতন বন্ধুগণ অনেকেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। আমি উপস্থিত না হইলে তাঁহারা খুবই দুঃখিত হইতেন, বলিলেন। এমন প্রীতি ভালোবাসা জীবনে আর কখনো লাভ হইয়াছে কি না মনে পড়ে না।

উইলিয়ামস্ কলেজ হইতে ফিরিবার পথে আমার দেশের এলাকায় আসিয়া পড়িতেই দেখি, একদল লোক আমার সাম্নে হাজির। বিষয় কি! না, "আপনাকে আমাদের প্রতিনিধি হইয়া রাষ্ট্র সভায় যাইতে হইবে।" আমি দেখিলাম, আমার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে পলাতকের মতো। আমি যেখানেই

যাই না কেন, ইহারা যেন কেমন করিয়া টের পায় এবং একই উদ্দেশ্য লইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চারিদিকে সকলে প্রস্তুত। আমি তাহাদিগকে নানা ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না--আমার যুক্তি টিকিল না—দেখিলাম তাহারা খুব সেয়ানা। শেষকালে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলাম—আমি ইস্কুল ছাড়িয়া কি প্রকারে যাই বলুন? "একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।" হিরামের শিক্ষকগণও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া আমাকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য জোর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার ইস্কুলের দায়িত্ব তাঁহারা নিজের মাথায় তুলিয়া লইলেন। তাঁহাদের চেষ্টাই ফলবতী হইল। আমাকে বাধ্য হইয়া ১৮৬০ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিতে হইল। সমুদয় দেশ তখন বিরাট উত্তেজনার বারুদ-স্তূপের উপর অবস্থিত। একদিকে রিপাব্‌লিকান্‌দের তখন অভ্যুদয় যুগ, অপর দিকে স্বার্থান্বেষী ডেমোক্রাট্‌গণের নিজ স্বার্থরক্ষার্থে অষ্টপ্রহর চোখ রাঙানি। দক্ষিণীরা ধমকের পর ধমক দিতে লাগিল, "যদি আগামী নির্ব্বাচনে কোনো রিপাব্‌-লিকান সভাপতির পদ লাভ করেন তাহা হইলে ঘরোয়া লড়াই অবশ্যম্ভাবী।" উত্তরীরাও কোনো বাক্যব্যয় না করিয়া সাহসীর মতো এবং জয়ীর মনোবৃত্তি লইয়া দাসত্বকে একেবারে গলাটিপিয়া মারিতে চাহিল।

রাষ্ট্র দরবারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আকাশ তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন। বিদ্যুৎভরা মেঘের মতো দুই দলই ঘুরাফিরা করিতেছে। এই গভীর অন্ধকারে সেখানে খুঁজিয়া পাইলাম দুইটী লোক—একজন পরবর্ত্তী কালের মেজর জেনারল জেকব্ ডি কক্স এবং অন্যতর অধ্যাপক মান্‌রো। একটা বিদ্যুতের চেয়ে ইঁহাদের এক একজনের শক্তি দশগুণ বেশি বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। আমরা তিন জনেই ছিলাম সমবয়সী।

১৯৬১ সালে আমি দ্বিতীয়বার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হই। সেনাপতি লিঙ্কল্‌ন্ তখন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্ব্বাচিত সভাপতি। সভাপতি রিপাব্‌লিকান দলভুক্ত হওয়ায় দক্ষিণের রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট হইতে সরিয়া পড়িতে প্রস্তুত হইল। কাজেই উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রদেশের ভিতর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রশ্নও উঠিল, "ওহায়ো কি সত্যই যুদ্ধ করিবে?" "নিজের ইচ্ছা মতো কোনো রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্র দরবার হইতে সরিয়া পড়িবার বিধান আছে কি?" "এবং তাহা হইলেও তা করা উচিত কি না?" "বিদ্রোহীদিগকে আমাদের শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কি?" ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের জবাব দিবার নিমিত্ত সভা আমাকে আদেশ দিলেন। রাত্রির পর রাত্রি বারোটা-একটা পর্য্যন্ত সরকারী গ্রন্থাগারে হাড়ভাঙ্গা

খাটুনির পর এই সকল এবং ইহাদের আনুসঙ্গিক প্রশ্নের জবাব তৈরী করিলাম। আমার এই সকল জবাব, যুক্তরাষ্ট্রের স্বদেশহিতৈষণাকে ভিত্তি করিয়াই বিদ্রোহীদিগের সভাত্যাগের এবং সিনেটের দাসত্বের সহিত রফার প্রতিকূলেই লিখিত হইয়াছিল। গোলামীর সঙ্গে রফা করিয়া চলা কোনোদিন শিখি নাই তাই অপরকেও তাহা শিক্ষা দিতে চাহি নাই। কি বেদনায় যে সেদিন বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার মতো হইয়াছিল তাহা আপনারা অনুভব করিতে পারিবেন কি না জানি না! যুক্ত-রাষ্ট্রের দরবারের দ্বার খুলিয়া দেখিলাম বিশ্বাসঘাতক ডেমো-ক্রাট্‌রা নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য গোলামীকে আরো কিছু কাল বহাল রাখিবার জন্য, দেশের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ডেমোক্রাট্‌ দলের সভাপতি বুকানন সভাত্যাগের পক্ষপাতীদিগকে খুব উৎসাহ দিতেছিল। উহাদের অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক নেতৃগণের ভিতর কব্‌ জাতীয় ধনাগার হইতে ধন অপহরণ করিয়া, ফ্লয়েড্‌ উত্তরাঞ্চলের প্রত্যেক অস্ত্রাগার হইতে অস্ত্রশস্ত্র চুরি করিয়া, তৌসি নৌবহর হইতে বহু জাহাজ দূরদূরান্তে পাঠাইয়া দিয়া নিজেদের বিশ্বাসঘাতক-তার গর্ব্বে উল্লসিত হইয়াছিল।

রিপাব্‌লিকানদের যদিও তখন জয়লাভের আশা দৃশ্যতঃ খুবই কম ছিল, তথাপি আমি জয়লাভের পূর্ণ আভাসই পাইতে ছিলাম। আমাদের ভিতর যোগ্যলোক অনেকেই ছিলেন,

জানি, তাঁহারাই এই বিপ্লবতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি আমার নিজের দিক হইতে বলিতে পারি যে, যে অবস্থায় তখন আমি অবস্থিত ছিলাম, আমার মন তখন যে রকম উদ্বেলিত ছিল, তাহাতে তাঁহারা সরিয়া পড়িলেও আমি একাই শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতাম এবং নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতাম।

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহীদিগকে শান্ত করিবার জন্য গোলামীপ্রধান রাজ্যগুলিতে গোলামী প্রথার উপর কোনো কঠোর আইন জারী না করিয়া একটী আইনানুমোদিত সংশোধন বিল প্রস্তাব করিলেন। এই আইন এবং এই ব্যবস্থা অনেকটা অবিবেচকের মতোই হইয়াছিল। ইঁহারা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ দেহে এই সকল আইনের দ্বারা তালি দিতে চাহিলেন, নিজেদের দুর্ব্বলতাকে মিথ্যা শান্তির নামে ছাই চাপা দিতে ব্যস্ত হইলেন। চিরদিন যে এই ভাবে যাইবে না, এই সুযোগ যে বিশ্বাসঘাতকরা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইবে, তাহা ইঁহারা হৃদয় দৌর্ব্বল্যের জন্যই মস্তিষ্ক স্থির রাখিয়া ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু আমি ওহায়ো সিনেটে, বিশ্বাসঘাতক দাসমনিবগণের বৈঠকের সাম্নে যে কোনোরূপ মীমাংসার প্রস্তাবকে জন্মভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং জয়ীর নিকট বিজিতের হীন আত্মসমর্পণের তুল্য গর্হিত বলিয়াই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমি সেদিন ঐ সিনেটে দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলাম যে, যে শান্তির নামে

গোলামীর পায়ে সত্য সত্যই আমাদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, হাত তুলিয়া তাহাকে সমর্থন করিবার পূর্ব্বে আমার হাত যেন অবশ হইয়া যায়। ব্যাপার যা ঘটিবে তাহা আর কাহারো বুঝিতে বাকি নাই—ক্রমে ইহা আরো স্পষ্ট হইবে—এই সময়ে কোনো মীমাংসা চলিতে পারে না। আমি জানিতে চাই, আপনারা দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র এবং রাজ্যরক্ষার পক্ষে দরকারী অন্যান্য সরকারী সম্পত্তি উহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া ভিক্ষুকের মতো উহাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবন যাপন করিবেন, না মানুষের মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া মনুষ্যত্বের জন্য লড়াই করিবেন, ইহাই আমার শেষ জিজ্ঞাস্য।

ওহায়োর নরনারী যখন মানুষের মতো দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিল ঠিক সেই সময় তাহার প্রতিশ্রুতির তুল্য এক কঠোর পরীক্ষাও তাহার সাম্‌নে আসিয়া হাজির হইল। সাম্‌টার দুর্গের পতনের পর প্রেসিডেন্ট লিঙ্কল্‌ন দেশের নিকট অবিলম্বে ৭৫ হাজার লোক চাহিয়া বসিলেন। সভাপতির আদেশ সমবেত লক্ষ লক্ষ স্বদেশ প্রেমিক দর্শকগণের সম্মুখে পঠিত হইবামাত্র উন্মত্ত জনতা ঘন ঘন জয়ধ্বনির দ্বারা তাঁহার হুকুম সমর্থন করিল। গগন বিদারী হর্ষধ্বনি নীরব হইলে, আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "বন্ধুগণ, অবনত নির্য্যাতিত দাস জাতির মুক্তি সংগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিকে ওহায়ো ২০ হাজার সৈনিক এবং ৯৩৭৫০০০ টাকা দিয়া সাহায্য করিতে

পারিবে কি ?" ভীষণ উৎসাহ, আনন্দ ও স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনার ভিতর তাহা সমর্থিত হইয়া গেল।

অতঃপর আমি ওহায়োর গবরনর ডেনিসন্ মহাশয়ের আদেশে মিশৌরী গমন করিয়া পাঁচ হাজার বন্দুক লাভ করিলাম। জেনারল লায়ন তাহার একাংশ সেইণ্টলুইসের অস্ত্রাগার হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আমি জাহাজে করিয়া সেই সকল বন্দুক আনিয়া নিরাপদে কলম্বাসে নামাইতে পারিয়াছিলাম।

সাম্‌টারের পতনের পর গবরনর ডেনিসন্ ৭ম ও ৮ম সংখ্যক ওহায়ো পদাতিক রেজিমেণ্ট গড়িবার জন্য আমাকে ক্লীভ-ল্যাণ্ডে পাঠাইলেন। সৈন্যদল গঠিত হইয়া গেলে গবরনর আমাকে উহার একটীর কর্ণেলের পদ গ্রহণ করিতে বলেন। আমার সামরিক অভিজ্ঞতা না থাকায় আমি উহা গ্রহণ করিতে রাজি হইলাম না। আমি অবশ্য তন্নিম্নস্থ কোনো সেনানীর পদ গ্রহণ করিতে রাজি ছিলাম, এই সর্ত্তে যে, যদি পশ্চিমা-ঞ্চলের কোনো গ্রাজুয়েটকে সেনানায়কের পদ দেওয়া হয়। ফল দাঁড়াইল এই যে, গবরনর আমাকে লেফটেনাণ্ট কর্ণেলের পদে নিয়োগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের আবাদে রেজিমেণ্ট গড়িবার জন্য পাঠাইলেন। তিনিও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি ঐ অঞ্চলের কোনো উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় তবে তাহাকেই ঐ পদে নিয়োগ করা হইবে। আমি ঐ পদের জন্য আমার

বাল্যবন্ধু ও সমপাঠী হাজেনের নাম করিলাম। সে নিয়মিত সৈন্যদলে কাজ করিত, কাজেই যোগ্য লোক সন্দেহ নাই। শেষ পর্য্যন্ত সৈন্যদল গঠিত হইল, কিন্তু হাজেনকে কর্ত্তৃপক্ষ ছাড়িয়া দিলেন না। বোধ হয় ইহা আমার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুগ্রহের ফল। অতঃপর বহু সংখ্যক হিরাম ছাত্রদের সমবায়ে ৪২ সংখ্যক ওহায়ো রেজিমেণ্ট গঠিত হইয়া যখন কলম্বাসের দিকে রওনা হইল, তখন উহা সেনাপতিহীন—কোনো কর্ণেল নাই। এই অবস্থায় সেনানীগণের এবং সৈন্যদের অনুরোধে আমাকে মত বদলাইতে হইল। আমিই কর্ণেলের পদ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া চলিলাম।

এক মাসের ভিতরেই এই সৈন্যদল লইয়া, সমর বিজ্ঞানে হাত পাকা হইতে না হইতেই জেনারল বুয়েলের অধীনে আমাকে মীড্‌ল ক্রীকের যুদ্ধ চালাইতে হয়। বিদ্রোহীদলের সৈন্য সংখ্যা আমার সৈন্যের কত গুণ ছিল, তাহা হিসাব না করিয়া বলা শক্ত। আমার সৈন্যদলের দৃঢ়তার নিকট বিদ্রোহী সেনাপতি জেনারল মার্শাল এমন ঘা খাইয়াছিলেন যাহার ফলে তাহাকে গোলামীর শ্রীপাট শ্রীধাম ভার্জ্জিনিয়ায় যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর "স্যাণ্ডি ভ্যালী অভিযানে" ও আমার সৈন্যদল জয়লাভ করিয়াছিল। আমি তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া শিখিয়াছিলাম—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা,

অধ্যবসায় এবং সাহস এই তিনটীই সৈনিকের আসল গুণ। ওয়াশিংটনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে ব্রিগেডিয়ার জেনারলের পদে উন্নীত করিলেন এবং ১৮৬২ সালের ১০ই জানুয়ারী যে দিন মিড্‌ল ক্রীকের যুদ্ধ জয় হয়, সেইদিন হইতে আমাকে কমিশন দেন। নীতির দিক হইতে এই পদ আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই, কিন্তু যখনই ব্রিগেডিয়ার জেনারলের পোষাক পরিধান করিতাম, তখনই মনে হইত তাঁহারা নিজে নিষ্কামভাবে মরিয়া গৌরবটা আমাকে দিয়া গেল। আমার সামরিক পোষাকের প্রত্যেক সূত্র প্রত্যেক কারুকার্য্য, যাহা কিছু সবই তাঁহাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই পোষাকের সঙ্গে হিরামের স্মৃতি জড়িত ছিল।

অতঃপর শিকামৌগার যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে মেজর জেনারলের পদে উন্নীত করেন। সেনানায়কের পক্ষে বিচক্ষণতা, সাহস এবং কার্য্যকালে নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া তাহা কাজে লাগাইবার ক্ষমতা এই তিনটী গুণ যে বিশেষ দরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই যুদ্ধ কালে আমার সব চেয়ে একটা বড় জিনিষ লাভ হইয়াছিল, সেটী মাল্লাগিরির সময়ের আমার সহকর্ম্মী হ্যারি ব্রাউন। হঠাৎ তাহাকে আমি চিনিতে পারি নাই, কিন্তু পরে আমরা উভয়ে নৌকার সাহায্যে যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। হ্যারি মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিল,

দেশের জন্য মরিয়া মানুষ পদবী লাভ করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আমার কাছে হাজির হইয়াছিল।

আমি তখন কেন্‌টাকি সৈন্যদলের সেনাপতির পদ পাইয়াছিলাম। হঠাৎ ১৮৬২ সালে ওহায়োর লোকেরা আবার আমাকে পাকড়াও করিয়া বসিল—কংগ্রেসে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য। আমি অস্বীকার করিলাম এবং তাহারা আমার অসুবিধাও বুঝিল। আমি রক্ষা পাইলাম মনে করিলাম কিন্তু কার্য্যকালে দেখি আমি প্রকৃতপক্ষে রক্ষা পাই নাই। এই বলিয়া প্রেসিডেন্ট লিঙ্কল্‌ন তাঁহার নিজের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, "সামরিক অভিজ্ঞতা এবং সমর বিজ্ঞানের দিক হইতে গার্‌ফীল্ডের কংগ্রেসে প্রবেশ করা নিতান্ত দরকার। নতুবা রাষ্ট্রের ভয়ানক ক্ষতি হইবে।" সভাপতির ইচ্ছা এবং আদেশ অস্বীকার করিতে পারিলাম না কাজেই ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাকে প্রতিনিধিদের ভিতর আসন গ্রহণ করিতে হইল।

১৮৮০ সালে সিনেটার আরমনের স্থানে ওহায়োর রিপাব্‌লিকান্‌গণ আমার নাম উত্থাপন করিয়া বসিল। এবারে তাহারা আমাকে কলম্বাসে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু সে অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারি নাই। আমি এই বলিয়া তাহাদিগকে আমার অসুবিধা জানাইয়াছিলাম যে, বন্ধুগণ আর যা' বল তা করিতে পারি, কিন্তু

পদপ্রার্থী বলিয়া আমি সেখানে হাত তুলিতে পারিব না। চাকুরীর জন্য জীবনে একবার মাত্র হাত তুলিয়াছিলাম সে হিরাম বিদ্যালয়ে জেনিটারের চাকুরী গ্রহণের সময়। উহার পূর্ব্বে আর হাত তুলি নাই, পরেও আর তা হইবে না। যদি দেশবাসী আমাকে চায় তবে তাহারা আমাকে নির্ব্বাচিত করিবেই। স্নেহ ভালোবাসার অত্যাচার বোধ হয় সত্যকার অত্যাচারের চেয়েও ভীষণ। বন্ধুরা ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন, "তোমাকে হাত তুলিতে হইবে না, শুধু একবার যাইবে মাত্র।" আমি বলিয়াছিলাম, "আমার নিকট ইহার চেয়ে ঘৃণার এবং লজ্জার বিষয় আর কিছুই নাই—আমি যাইব না। যদি মনোনীত হই পরে নিশ্চয়ই যাইব।" শুনিয়াছিলাম, অন্যান্য যাঁহারা প্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহারা কোনো প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহেন নাই। কাজেই সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে আমিই সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম।

নির্ব্বাচনের শেষে কলম্বাসে গিয়া ব্যবস্থাপক সভার উভয় শাখাকে সমবেত ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম, "বিগত বিশ বৎসরকাল আমি কর্ম্মী জীবন যাপন করিতেছি। তাহার ভিতর প্রায় আঠারো বৎসর কংগ্রেসের ভিতর দিয়াই অতিবাহিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের সুদীর্ঘ কর্ম্মস্রোত একটী উদ্দেশ্যেই চিরদিন ধাবিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভালোমন্দ ভুলভ্রান্তি কিছু হইয়াছে কি না জানিনা। তবে

যৌবনকাল হইতেই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার জীবনের উদ্দেশ্যকে ধরিয়াই চলিতে থাকিব, ইহাতে ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের কোন হিসাব করিব না।

"বহুবৎসর কংগ্রেসে আমি একটী জিলার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি। আজ তাহার মতামতকেই আমার সাফল্যের মাপকাঠি নির্দ্দেশ করিতেছি। হয়তো তাঁহারা কোথায়ও আমার সহিত তাঁহাদের মতের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া থাকিবেন। তথাপি আমি শুধু একটী লোকের অনুমোদনের উপরই নির্ভর করিব—তাহার নাম গার্‌ফীল্ড। সেই একমাত্র সঙ্গী যাহাকে আমি জীবনের কোনো অবস্থাতেই দূরে রাখিয়া চলিতে পারি না। যদি আমি তাহার অনুমোদনও না পাই তবে আমার জাহান্নমে যাওয়াই উচিত।"

১৮৮০ সালের জানুয়ারী মাসে আমি সিনেটার নির্ব্বাচিত হই। সেই বৎসরেরই নবেম্বর মাসে আমার দেশবাসী আমার প্রতি অকপট ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ আমাকে যুক্ত-রাষ্ট্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। আমি ভোটের জোরে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসন লাভ করার চেয়ে দূরে থাকিয়া আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন অনেক বড় মনে করি। যে কাজে আমার দেশবাসীর সমর্থন নাই তাহাতে আমার মাথা ঘামাইবার কোনোদিন কোনো প্রয়োজন মনে করি নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসনের চেয়েও মূল্যবান আমার

দেশবাসীর হৃদয়। অর্থবলে এবং লোক বলে রাজ্য জয় হইতে পারে, কিন্তু হৃদয় জয় হয় না। আমি নেতা সাজিবার জন্য দেশবাসীর হৃদয় জয় করিবার ফিকিরে কোনোদিন ছিলাম না। আমি সকল সময় কাজ করিয়া যাইতেছিলাম তাহাদের বিশ্বস্ত সেবক এবং অনুরক্ত বন্ধু হিসাবে। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসন আমার নিকট বিশ্বস্ততার এবং বন্ধুত্বের উপহার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমি দাসত্বের পৃষ্ঠপোষক ডেমোক্রাটদের জাতশত্রু! কি বাক্যে, কি মনে, কি শরীরে, সকল দিক হইতে সকল প্রকারেই আমি তাহাদের ধ্বংস কামনা করিতাম। অথচ আমার সভাপতির পদ লাভ করিবার ভিতর তাহাদের কি স্বার্থ ছিল তাহা আমি আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। নির্ব্বাচন উপলক্ষে ডেমোক্রাট্ এবং রিপাব্লিকান দীর্ঘকালের বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের করমর্দ্দন করিল। আমার নির্ব্বাচনে রিপাব্লিকান যতটা আনন্দিত হইয়াছিলেন, আমি জনকতক ডোমোক্রাট্কে দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম তাহারাও ইহাতে কম আনন্দিত হয়েন নাই। নির্ব্বাচন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা নির্ভাবনা হইতে পারেন নাই। আমার জয়ের জন্য ডেমোক্রাট এবং রিপাব্লিকান সমভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে কোরিন্থের স্বদেশ প্রেমিক ভাই-

মোলিওন কার্থেজের অত্যাচারে সিসিলিবাসী নির্য্যাতিত কোরিন্থীয়দিগের পক্ষে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে কার্থেজীয়গণ ভীষণভাবে পরাজিত হয়। তাইমোলিওন রাজসিংহাসন-লোলুপ ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন সিসিলির মঙ্গল। সিসিলির সকল পদার্থকেই তিনি এক মনে করিতেন। ফলে বিজিত কার্থেজগণ তাঁহার চরিত্রগুণে বাধ্য হইয়া তাঁহার অনুরক্ত হয়। তাঁহার ন্যায়পরতার কাহিনী ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। তাইমোলিওনের মৃত্যুতে সিসিলির সকলেই সমভাবে অশ্রু ফেলিয়াছিল। জগতের ইতিহাসে এমন চরিত্র আর দ্বিতীয়টী দেখা যায় না। তাঁহার চরিত্রকাহিনী আমার জীবনগঠনের অন্যতম উপাদান। আমি, দাসত্বের পৃষ্ঠপোষক ডেমোক্রাট্‌দেরই যে পরম শত্রু, ইহা যে তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, ইহাই পরম আনন্দের কথা।

১৮৮১ সালের মার্চ্চমাসে রাজকীয় শোভাযাত্রা করিয়া আমাকে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসনে অভিষিক্ত করা হয়। আমার মত দরিদ্রের পক্ষে এত বড় জাঁকজমক এবং মহোচ্চ সম্মানলাভে মাথা ঠিক না থাকিবারই কথা—কিন্তু আমার ছিল। চাষী, মিস্ত্রী, কাঠুরিয়া, মাল্লা এবং শিক্ষক গারফীল্ডের জীবনের ইহা আর একটা অবস্থা মাত্র। এই সম্মান আমার মাথায় তুলিয়া দিয়া দেশবাসী তাহাদের কাজে

আমাকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বহাল করিলেন, বুঝিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি অন্য চিন্তা করিতে পারিতাম। এখন এই দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, এখন হইতে যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গল চিন্তাই আমার একমাত্র কাজ। এ পর্য্যন্ত আমি নিজের জন্য কিছুই করি নাই, করিবার ইচ্ছাও রাখি নাই। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত আসিবার পক্ষে আমাকে নানা প্রকারে সুযোগ দিয়াছেন আমি কোনোদিনই তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করি নাই। তাঁহাদের দেওয়া সুযোগকে আরো বড় করিয়া শক্তিমান করিয়া আমি তাঁহাদেরই কাজে লাগাইয়াছি। ভবিষ্যতেও যে তাহাতে আমার কোনো ত্রুটী হইবে না, বোধ হয় এই বিশ্বাসই তাঁহাদিগকে এই পথে চালিত করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজপ্রাসাদে বসিয়া আমার অতীত আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জাগতিক দিক হইতে মাকে আমি কোনোরূপে সুখী করিতে পারি নাই। তিনিও সে সুখ চাহেন নাই। তিনি আমাকে শিক্ষক অথবা ধর্ম্ম প্রচারক রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আশা অপূর্ণ রহে নাই। দেশবাসীর এই শ্রদ্ধা ভালোবাসার মূলে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টাও প্রার্থনাই সর্ব্বদা প্রবল হইয়া রহিয়াছে। আমাকে মানুষ করিয়া তোলাই তাঁহার যেন একমাত্র কাজ

ছিল। কিন্তু আমার দাদার কথাই সব চেয়ে আজ বড় হইয়া মনে পড়িতেছে। সেই দশ বৎসর বয়সে নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া পারিবারিক সুখের জন্য না করিয়াছেন এমন কাজ নাই। নিজের মানুষ হওয়ার সকল চেষ্টা ডুবাইয়া দিয়া আমার জন্যই ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন! অরেঞ্জের লগ্‌ কেবিন হইতে ওয়াশিংটনের রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত কণ্টক সঙ্কুল অসমান সুদীর্ঘ রাস্তা আমারই জন্য তিনি নিজের বুক দিয়া পরিষ্কার এবং সমতল করিয়া দিয়াছেন। আমার গৌরবময় ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে কত অশ্রু ফেলিয়াছেন। তাঁহার সে অশ্রু ব্যর্থ হয় নাই। দরিদ্র-জীবনে কর্ম্ম করিতে করিতে যখন তাঁহার গড়া ভবিষ্যৎকে অবসাদ ধূলিরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে দেখিয়াছি, তখন তাঁহারই অশ্রু সে ধূলিরাশিকে সরাইয়া দিয়া আমার দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে। আমার শৈশব-বাল্য-কৈশোরের অরেঞ্জের 'লগ্‌ কেবিন' এবং মায়ের স্নেহ, ভাইবোনদের ভালোবাসা, ওয়াশিংটনের রাজ প্রাসাদ হইতে বড়ই মধুর মনে হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে না আসিলে এ অভাব বুঝিতে পারিতাম না।

"বন্ধুগণ! কর্ম্ম করিয়া যাও। লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া, ডাইনে বামে না চাহিয়া সোজা চলিতে থাক। নিজের জন্য এক আধ ছটাক কাজ করিতে যাইয়া মহামূল্য জীবনটাকে অনর্থক বলি দিও না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাজ যাহা

সাম্‌নে আসিবে তাহাকে সাগ্রহে ডাকিয়া লও। জীবনের কোন্ সময়ে কোন্ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে, তাহা বলা শক্ত। আমরা সকলেই জগৎকে সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিবার জন্যই আসিয়া থাকি।

ইতিপূর্ব্বে কত লোকের কত প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে আমরা কতকটা মানুষ হইবার সুযোগ পাইয়াছি।

ভবিষ্যতে যাহারা আসিতেছে এই পাওনাটাকে উত্তরাধিকার সূত্রে তাহাদের হাতে বুঝাইয়া দিয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দানটা যাহাতে নগণ্য না হয় সেদিকে আমাদের প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাই বলি, অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম কর, সর্ব্বদাই নিজেকে কি হর্ষ কি বিষাদ সকল অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চেষ্টা কর। নাম যশের মোহে দৃষ্টি খাটো করিয়া ফেলিও না। নিজে মানুষ হও, অপরকে মনুষ্যত্বলাভের সুযোগ দাও। দেখিবে শত শত যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসন তোমার পায়ের তলায় লুটাইতেছে।”

শেষ